সম্পাদকীয় মন্তব্য

বাংলাদেশের সর্বত্র খাবার পানিতে বিশেষত: নলকূপের পানিতে দূষণ মাত্রার উপরে আর্সেনিকের উপস্থিতি, এর ভয়াবহতা, জনস্বাস্থের প্রতি হুমকি, সম্ভাব্য সমাধান, উত্তর আমেরিকার পেশাজীবি বাঙালীদের অবদান ও সম্ভাব্য ভূমিকা নিয়ে গোটা চারেক তথ্যপূর্ণ নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো এ সংখ্যা পড়শীতে। গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়ে পাঠকদের মাথাভারী করা উদ্দেশ্য নয়। বরং বিজ্ঞানভিত্তিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবরক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

নব্বই দশকের শুরুতে সংকটের অশনি সংকেত নিয়ে এগিয়ে আসে যে ঢাকা কম্যুনিটি হাসপাতাল তার প্রজেক্ট ডিরেক্টর রণজিত দাস দাঁর মাঠ-পর্যায়ের তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের অপ্রতুলতার কথা বলেছেন। আরো বলেছেন শুধু আর্সেনিক দূষণের কারণে বাংলাদেশের কোটি কোটি লোক আজ অদৃশ্য আততায়ীর সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি বাংলাদেশের সেচের পানিতে উৎপাদিত ফুড চেইনে উচ্চমাত্রায় আর্সেনিক উপস্থিতির আরো খারাপ খবর দিয়েছেন।

বাংলাদেশকে নিজের দেশ হিসেবে বেছে নেয়া বিদেশিনী সিলভিয়া মোর্তুজা তাঁর অবসর জীবনের পুরোটাই উৎসর্গ করেছেন সাধারণ মানুষগুলোকে এ দুর্যোগ থেকে উদ্ধারের উদ্যোগে। তাঁর প্রবন্ধে তিনি পানি থেকে আর্সেনিক মুক্তকরণে ফিটকিরি (অ্যালাম)'র বহুল ব্যবহার এবং রান্না-বান্নায় অ্যালুমিনিয়ামরে হাড়ি-পাতিল ব্যবহারের কারণে আর্সেনিকের ক্যান্সার ছাড়াও পুরো জাতিকে আলঝেইমার রোগের মাধ্যমে একটা নির্জীব জাতিতে রূপান্তরের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

নিউ ইয়র্কের ওয়েগনার কলেজের রসায়নের অধ্যাপক এবং ঢাকার ইন্ট্রনিক্স টেকনলজি সেন্টারের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলাউদ্দীন প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম যিনি আর্সেনক যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত আধুনিক মূত্র পরীক্ষার ভিত্তিতে আর্সেনিক চিকিৎসা এখন চিকিৎসকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক আলাউদ্দীন বাংলাদেশের ও প্রবাসের যৌথ সংঘবদ্ধ উদ্যোগে উদ্ভাবিত ৩-কলসী আর্সেনিক দূরীকরণ পদ্ধতির আবিষ্কর্তাদেরর একজন। অধ্যাপক আলাউদ্দীন তাঁর প্রবন্ধে মূত্র পরীক্ষা পদ্ধতি ও মানবদেহে আর্সেনিকের প্রাণরসায়ন প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আর্সেনিক সংকট মোকাবেলায় প্রবাসীদের সংঘবদ্ধ ভূমিকার সফল উদ্যোক্তা এবং বাংলাদেশ কেমিক্যাল এন্ড বায়োলজিক্যাল সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা'র প্রাক্তন সভাপতি ও উপদেষ্টা সাবির মজুমদার তাঁর প্রবন্ধে এযাবৎকালীন উত্তর আমেরিকার কয়েকটি হাতে গোণা বাংলাদেশী সংগঠনের খন্ড খন্ড উদ্যোগের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাতে কিঞ্চিৎ সাফল্যের চিত্র থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় এ সকল উদ্যোগ ও কর্মকান্ড হতাশাব্যাঞ্জক। তাঁর আলোচনায় আর্সেনিক সমস্যা মোকাবেলায় বাফি ও বাংলাদেশ কংগ্রেশনাল ককাসের আন্তর্জাতিক লবিং-এর উদ্যোগ অর্থবহ। মজুমদার তাঁর প্রবন্ধের পরিশেষে আশা প্রকাশ করেছেন যে বাংলাদেশী পেশাজীবীরা ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলে আর্সেনিকের সমষ্যা মোকাবেলা করা সম্ভব।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তির কবিতা 'শয়তানের জল' আর্সেনিক সমস্যার জলছবি। চক্রবর্তি সে সকল সাহসী মানুষদের একজন যিনি আর্সেনিক আক্রমণের ঘন্টাধ্বনি বাজান সবার আগে পশ্চিমবঙ্গে আশির দশকের মাঝামাঝি। আর্সেনিক সমস্যা নিয়ে রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে তিনি এখন বিশ্ববাঙালীদের একজন। তাঁকে অনুসরণ করতে পারলে বাঙালীদের গৌরব বাড়বে বৈ কমবে না। সময় অভাবে এ সংখ্যায় তিনি তথ্যনির্ভর প্রবন্ধ লিখতে না পারায় পড়শী'র কাছে দু:খ প্রকাশ করেছেন। ❑

'আর্সেনিক সমস্যা' সংক্রান্ত এবারের বিশেষ বিভাগটির সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছেন পড়শী'র ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ড: সাবির মজুমদার।

শয়তানের জল

দীপংকর চক্রবর্তি

ওরা চীৎকার করে পালিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে -
শয়তানের জল উঠছে পালা।
ছুঁতে চায়নি, মুখে তোলা তো দূরের কথা।

ত্রাণকর্তা মোসাহেবের দল বোঝাল নির্বিচারে
আসবে সবুজ বিপ-ব, নিরোগ শরীর,
গ্রহণ করো অঞ্জলি ভরে, এ ভগবানের দান।

রক্তে লাগল নেশা, শয়তান হল ভগবান।
সার্থক হলো শয়তানের অভিপ্রায়,
শরীর জুড়ে ফুটে উঠল শয়তানের হাসি।

কে গোপনে কাঁদে আঁচলে মুখ ঢেকে?
দুচোখে উদ্বেগ কার খন্ড মেঘের মতো?
- আমি প্রকৃতি, সনাতনী মা।
জল যে আমার রক্তবহতা,
মায়ের রক্তে মিটেছে পিপাসা?

চোখ পেতে দেখ চেয়ে সন্তান আমার -
রয়েছে অমৃতধারা সঞ্চিত চারদিকে,
তাকে দূরে ঠেলে রাখো কোন মূঢ় রোধে?
এখনও সময় আছে, এখনও সময় -
মায়ের রক্ত নয়, লহ স্তন্য রসধারা।
গ্রামে আছ, গঞ্জে আছ, যেখানে মানুষ আছ আমার ও পর,
আমার ভান্ডার লহ তুলে পূর্ণ সমবায়ে।

দীপংকর চক্রবর্তি : স্কুল অব এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত।

বাংলাদেশে আর্সেনিক সমস্যা

৮ কোটি লোক ঝুঁকির মধ্যে

রনজিত দাস

বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে ব্যাপক মাত্রায় আর্সেনিক দূষণের বিষয়টি জনস্বাস্থ্যে মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৯ জেলার প্রায় ৮ কোটি লোক এই সমস্যার মুখোমুখি। দেশের প্রায় ৩ কোটি লোক প্রতিদিন আর্সেনিকের নীরব বিষ পানির সঙ্গে পান করে চলছে। মাত্র ২ হাজার গ্রামে এক জরিপ চালিয়ে ১১ হাজার আর্সেনিক রোগীকে সনাক্ত করা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে- দেশে এখন প্রায় ২ লাখ আর্সেনিক রোগী রয়েছে এবং প্রতিদিন রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এদের মধ্যে অনেকে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে। প্রতিদিন ক্যান্সার আক্রান্ত আর্সেনিক রোগীর সংখ্যা বাড়ছে।

প্রাথমিক জরিপে দেখা গেছে, দেশের বেশি আর্সেনিক আক্রান্ত জেলাগুলোতে ৬০ থেকে ৯৫ ভাগ নলকূপ আর্সেনিক দূষিত। এমন শত শত গ্রাম পাওয়া যাচ্ছে যেখানে শতকরা ১০০ ভাগ নলকূপের পানিতে উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। বিকল্প খাবার পানির কোন ব্যবস্থা না থাকায় বিপজ্জনক জেনেও মানুষ আর্সেনিক দূষিত পানি পান করে চলছে। এই অবস্থা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামেই বিরাজ করছে। এই সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সরকারি উদ্যোগ এতই সীমিত যে, তা উলে-খ করার মতো নয়। বেসরকারি উদ্যোগ তেমনই সীমিত, সমস্যার ব্যাপকতার নিরীখে সমস্যা মোকাবেলার উদ্যোগ নেই। এ কাজের জন্য দাতারা প্রচুর অর্থ খরচ করছে কিন্তু প্রকৃতভাবে তা গ্রামের লোকদের কাছে পৌঁচাচ্ছে না।

বাংলাদেশে আর্সেনিক সমস্যা প্রথম ধরা পড়ে ১৯৯৩ সালে, কিন্তু কোন এক অজানা কারণে সমস্যার কথা গোপন করা হয়, সাধারণ মানুষকে জানতে দেয়া হয়নি। ১৯৮৮ সাল থেকে ভারতের বিজ্ঞানীরা বাংলাদেশের সরকার ও বিশ্ব সংস্থাগুলোকে লিখিত ভাবে জানিয়ে আসছিল, বাংলাদেশের খাবার পানিতে আর্সেনিক দুষণ ঘটছে কিন্তু বাংলাদেশের সরকার কিংবা বিশ্ব সংস্থাগুলো গুরুত্ব না দিয়ে, শত শত কোটি টাকার নলকূপ বসানোর কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। এমনকি, ১৯৯৩ সালে নির্দিষ্টভাবে সমস্যা জানার পরও বাংলাদেশের সরকার ও বিশ্ব সংস্থাগুলো শত শত কোটি টাকার নলকূপ বসানোর কাজ চালিয়ে যেতে থাকে এবং সমস্যাটিকে ব্যাপক করে তোলে। এক জরিপে দেখা গেছে, ১৯৯৩ সালের পর থেকে দেশে বর্তমান নলকূপের ৬০ ভাগ বসানো হয়েছে যাদের মধ্যে আর্সেনিক দূষণ এলাকায় ৫০-৯৫ ভাগ নলকূপ আর্সেনিক দূষণ হয়েছে।

এখন সকলেই স্বীকার করছেন, বাংলাদেশের আর্সেনিক সমস্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব বৃহৎ দুর্যোগ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, সমস্যা এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে প্রতি বছর আর্সেনিক জনিত ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২ লাখ লোক মারা যাবে।

বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে ব্যাপক আর্সেনিক দূষণের বিষয়টি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বেসরকারি সংগঠনগুলোর মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল (ডিসিএইচ)। ১৯৯৬ সাল থেকে কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এসওইএস-এর সঙ্গে বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণের বিস্তার নিরূপনের জন্য ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল অসংখ্য জরিপ পরিচালনা করে আসছে। প্রথমে তিনটি জেলার ২১টি গ্রামে জরিপ চালানো হয়। এরপর ক্রমান্বয়ে গত বছরের ডিসেম্বর (২০০০) পর্যন্ত ডিসিএইচ দেশের ৬৪ টি জেলার ৪০ হাজার নলকুপের পানি পরীক্ষা করে। এই ৬৪ টি জেলার মধ্যে ০.০১ মিলিগ্রাম(মিগ্রা)/লিটার-এর চেয়ে বেশী মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গেছে, ৫৪টি জেলার অধিকাংশ পরীক্ষিত নলকূপে এবং ৪৭টি জেলার অধিকাংশ পরীক্ষিত নলকূপে ০.০৫মিগ্রা/লিটার-এর চেয়ে বেশী মাত্রার আর্সেনিক পাওয়া গেছে। তবে ৫৯ জেলার নলকুপের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। ১২ জেলার খুব কম সংখক নলকুপে আর্সেনিক পাওয়া গেছে।

ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান আর্সেনিক বিষয়ে কর্মসূচি পরিচালনা করেছে। বাংলাদেশে প্রথম 'আর্সেনিক দূষণ শনাক্তকরণ কর্মসূচি' শিরোনামে ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের প্রথম জরিপটি পরিচালিত হয় ১৯৯৬ সালে। ডিসিএইচ-এর ১০ সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল এ সময় পাবনা, কুষ্টিয়া এবং মেহেরপুর জেলার ২১টি গ্রামে জরিপ চালায়। এরমধ্যে পাবনার গ্রামের সংখ্যা ১২টি, কুষ্টিয়ায় ৮টি এবং মেহেরপুরে ১টি। জরিপে উক্ত গ্রামগুলো পরীক্ষা করে ১৫০ জনকে আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়। জরিপে এছাড়াও ৭৪টি নখ, ৭৪ টি চুল, ৬৫টি ত্বক, ৬৩টি প্রশ্রাব এবং ৪১টি নলকুপের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে ল্যাবরেটরী পরীক্ষায় ৭০টি নখ (৯৫%), ৭১টি চুল(৯৬%), ৫৯টি প্রশ্রাব (৯৪%) এবং ২৭টি পানির (৬৬%) নমুনায় স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে অনেক বেশী আর্সেনিক সনাক্ত করা হয়। পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা গেছে, শতকরা ২৮ভাগ আক্রান্ত লোকের প্রশ্রাবে স্বাভাবিকের চেয়ে ১০০ থেকে ১৫০০ গুণ, ৪৭ ভাগের নখে ৮ থেকে ২০ গুণ এবং ৯৮ ভাগের ত্বকে ১০০ গুণের বেশী আর্সেনিক রয়েছে। পরীক্ষিত পানির ২০শতাংশ নমূনার মধ্যেও আর্সেনিক পাওয়া গেছে স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে ১০০ - ৯০০ গুণ বেশী।

ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল এই জরিপের ফলাফল ১৯৯৬ সালের ২৬শে নভেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশবাসীকে জানায়। এই প্রথম দেশের মানুষ জানতে পারলো দেশে আর্সেনিক সমস্যা নামে ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রচারণার পর সরকারিভাবে এবং বিশ্ব সংস্থাগুলো ক্রমাগতভাবে এ সমস্যা প্রকাশ্যে অস্বীকার করে এবং একে অপপ্রচার বলে উলে-খ করে। এক বছর পর তারাই আবার প্রচার করে- বাংলাদেশের আর্সেনিক সমস্যা - a national disaster.

পরবর্তীতে ইউএনডিপির আর্থিক সহযোগিতায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের অধীনে ২৮ জেলার ৫০০টি গ্রামের প্রতিটি নলকূপ পরীক্ষা এবং রোগী সনাক্ত করার কাজ ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল বাস্তবায়ন করে ১৯৯৭ সালে। এটি করা হয় সমস্যার ভয়াবহতা জানার জন্য। এর উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকার প্রায় ২৫০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করে। ৫০০ গ্রামের জরিপ থেকে জানা যায়- ৬২ ভাগ নলকূপ আর্সেনিক দূষিত এবং প্রতি হাজারে ৩ জন লোক

আর্সেনিক রোগী। এছাড়া এ পর্যন্ত যত নলকূপ পরীক্ষা করা হয়েছে, তার ফলাফল থেকে দেখা যায়- গড়ে প্রায় ৬০ ভাগ নলকূপ আর্সেনিক দুষিত।

এই জরিপ এবং ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল-এসওইএস পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন সংস্থা আর্সেনিক সমস্যা সমাধানে কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর মধ্যে সরকারের অধীনে 'বাংলাদেশে আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ-ই প্রজেক্ট' ও ইউনিসেফের আর্সেনিক মিটিগেশন প্রকল্প অন্যতম। ৪৬০ টি উপজেলার মধ্যে ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ৫-৭ ভাগ নলকুপের পানি পরীক্ষা করা হয়েছে। এখন আমাদেরকে আরো ৯৩-৯৫ ভাগ নলকূপ পরীক্ষা করতে হবে।

সরকারি প্রকল্পের অধীনে দেশের সবগুলো নলকূপ ২০০০ সালের মধ্যে শেষ করার টার্গেট থাকলেও এ পর্যন্ত শেষ করা হয়েছে মাত্র ৫ ভাগ। সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতি হতাশাজনক, অন্য দিকে দেশের কোটি কোটি মানুষ জানে না তাদের নলকূপের পানি আর্সেনিক নিরাপদ কিনা ? আবার সরকারিভাবে যেসব এলাকায় আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়েছে, সে সব এলাকায় নিরাপদ কোন পানির ব্যবস্থা করা হয়নি। কার্যত আর্সেনিক সমস্যার কথা জানার পরও নিরূপায় হয়ে আর্সেনিক বিষযুক্ত পানি পান করে চলছে। ফলে সরকারি আর্সেনিক কার্যক্রম সাধারণ মানুষকে কোন আশার আলো দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

বেসরকারী বেশ কিছু সংস্থা বৈদেশিক সহযোগিতায় বিছিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রম সমালোচিত হচ্ছে, কারণ এনজিওরা কেবল তাদের বসানো নলকূপ কিংবা তাদের গ্রুপ সদস্যদের নলকুপ পরীক্ষা করে অন্যদের নলকূপ পরীক্ষা করে না বা আর্সেনিক সংক্রান্ত কোন সুবিধা প্রদান করে না। সামগ্রিকভাবে দেখা যায়- এনজিওরা আর্সেনিক সমস্যা পীড়িত কোন এলাকায় নিদিষ্ট গ্রামে সকল লোকের সমস্যা সমাধানে কোন পদক্ষেপ না নেয়ার ফলে এলাকার মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। সার্বিক সমাধানে বিচ্ছিন্ন কার্যক্রম কোন ভূমিকা রাখছে না।

আর্সেনিক সমস্যার মুল উৎস ভূ-গর্ভস্থ গঠনগত কারণ। ভূ-গঠনগত কি কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হলো সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনও নির্দিষ্ট করে সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হচ্ছে না। হাজার হাজার বছর ধরে পলল জমে সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ। গঠনগত কারণে মাটিতে দীর্ঘদিন থেকে আর্সেনিকের অবস্থান রয়েছে। বিভিন্ন কারণে অধিক মাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে পানির সঙ্গে মিশে যায় এবং তা নলকূপের মাধ্যমে খাবার পানিতে চলে আসে। পরীক্ষায় দেখা যায়, ৪০-৮০ ফুট গভীরতার মধ্যে আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ অধিক। উক্ত গভীরতার মধ্যে প্রায় ৭০ ভাগ নলকূপে আর্সেনিক দূষণ পাওয়া যাচ্ছে। দেখা যায়- গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা কম। তবে এ ও দেখা গেছে, ৯০০ ফুট গভীরতায়ও বেশ কিছু নলকূপের পানিতে উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। গভীরতার উপর ভিত্তি করে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় যে বেশি গভীরতায় আর্সেনিক সমস্যা নেই। যদিও এমন চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ৩ মিগ্রা/লিটার(যা বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.০৫ মিগ্রা/লিটার থেকে ৬০ গুণ বেশি)। তবে বাংলাদেশের বেশির ভাগ নলকূপের পানিতে ০.১ -০.৫ মিগ্রা/লিটার আর্সেনিক রয়েছে। বাংলাদেশের আর্সেনিকের সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ০.০৫ মিগ্রা/লিটার যা নিয়ে ইতিমধ্যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। হু (WHO) নির্ধারিত মাত্রা হচ্ছে ০.০১ মিলিগ্রাম/লি। আমাদের লোকের পুষ্টিমাণ কম ও পানি গ্রহণের পরিমাণ বেশি হওয়ার কারণে আমদের জন্য নির্ধারিত মাত্রা (০.০৫) স্বাভাবিকভাবে বেশি। ইতিমধ্যে দাবি উঠেছে আমাদের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.০১ মিগ্রা/লিটার করতে হবে।

আর্সেনিকের অস্বাভাবিক মাত্রা মানব দেহে মারাত্বক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করার ফলে মানবদেহে তাৎক্ষণিক কোন ক্ষতিকর প্রভাব দেখা দেয় না, তবে দীর্ঘমেয়াদী বিষক্রিয়া দেখা দিয়েছে। দেখা গেছে, একাধারে ৬ মাস থেকে ৬ বছর পানি পান করার ফলে মানব দেহে ক্ষতিকর লক্ষণ দেখা দিতে পারে। মানবদেহে লক্ষণ দেখা দেয়ার শুরুতে শরীরে কালো-কালো দাগ দেখা দেয়, যাকে মেলানোসিস বলে। এটি অসুখের প্রাথমিক স্তর। পরে হাত ও পায়ের তালু খসখসে ও গোটা গোটা দেখা দেয়। এক সময় ঘায়ে পরিণত হয়। কারো করো ক্যান্সার হচ্ছে। যাদের ঘা হচ্ছে এবং ক্যান্সার হচ্ছে তারা নিশ্চিত মারা যাচ্ছে। এছাড়া যাদের শরীরে কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না তাদের শরীরে উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে। এরাও বিভিন্ন জটিলতায় ভুগছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন- যারা একাধারে ৬ মাসের বেশি সময় ধরে অধিক মাত্রার আর্সেনিক পানি পান করেছেন তারাও একসময় ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন। এই ধারনা যদি সত্যি হয় তাহলে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক লোক ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে রয়ে যাচ্ছে।

এ পর্যন্ত সনাক্ত করা রোগীর মধ্যে দেখা গেছে, ১০ ভাগ শিশু রয়েছে যাদের বয়স ১২ বছরের নীচে। ৪ বছরের শিশুও আক্রান্ত হচ্ছে। ৭০ ভাগ রোগীর বয়স ৩৫ বছরের নীচে। আক্রান্তের এই চিত্র ভয়াবহ।

এখন পর্যন্ত আর্সেনিক রোগী চিকিৎসার জন্য কোন নিদিষ্ট ওষুধ নেই। একমাত্র পরামর্শ হচ্ছে আর্সেনিক মুক্ত পানি পান করা । দেখা গেছে, প্রাথমিক পর্যায়ে রোগী আর্সেনিক মুক্ত পানি পান করতে থাকলে রোগ কমতে থাকে। কিন্তু এটি সত্য যে রোগীদের জন্য আর্সেনিকমুক্ত পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। এছাড়া রোগীদের জন্য ন্যুনতম কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা সরকারিভাবে কিংবা এনজিওরা করছেনা। কেবল মাত্র ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে রোগীদেরকে আর্সেনিকমুক্ত পানির ব্যবস্থা করছে এবং চিকিৎসা করছে।

আর্সেনিকের কারণে দেশে বড় ধরণের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আর্সেনিক আক্রান্ত শিশুরা অন্য শিশুদের সঙ্গে মিশতে বাধা পাচ্ছে, কাউকে কাউকে স্কুলে থেকে বাদ দেয়া হচ্ছে। আক্রান্ত অনেকে সমাজচ্যুত হচ্ছে। বিবাহিত নারীদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটছে। বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে না।

সেচের পানিতে বিপুল মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গেছে। ফুড চেইনে আর্সেনিকের প্রভাব নিয়ে ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গবেষণা করছে। প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে, কোন কোন শাক-সবজী এবং দানা জাতীয় খাদ্য শস্যে উচ্চমাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতি পাওয়া গেছে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি ভয়াবহ ইংঙ্গিত বহন করছে। কোন কোন বিজ্ঞানী আশংকা করছেন আর্সেনিক যুক্ত সেচের পানি ব্যবহারের ফলে অদূর ভবিষ্যতে ফসলের ফলন কমে যাবে। এমন পরিস্থিতি বাংলাদেশকে ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ভয়াবহ এই সমস্যা সমাধানের যে ধরনের উদ্যোগ প্রয়োজন তা দেখা যাচ্ছেনা । সকলে এক যোগে সমস্যা মোকাবেলায় কাজ করা অত্যন্ত জরুরী। ❑

রনজিত দাস : প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল, ১৯০/১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭, বাংলাদেশ, email:dch@bangla.net

ঘরে বসে নিয়মিত 'পড়শী' পেতে হলে
আজই গ্রাহক হয়ে যান
গ্রাহক ফর্ম-সহ প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য
আমাদের ওয়েব সাইটে আসুন :
www.porshi.com

আর্সেনিক বিষয়ক ব্যাপারসমূহ

সিলভিয়া মোর্তুজা

আর্সেনিক-দূষিতকরণ রোধকল্পে কোন ফলপ্রসূ কাজ করা হচ্ছে না- এমন একটা ধারণা যখন সবার মধ্যে গড়ে উঠছে ঠিক তখনই নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে ঘর-গৃহস্থালীতে যে আর্সেনিক দূরীকরণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সেগুলো রাসায়নিক সমস্যার সৃষ্টি করছে। ঘর-সংসারে ব্যবহৃত এসব পদ্ধতি অ্যালুমিনিয়াম সালফেট (অ্যালাম)-এর ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছে, যার ফলে আর্সেনিক-হ্রাসকল্পের ব্যবস্থাগুলো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে। অ্যালাম থেকে অ্যালুমিনিয়াম সৃষ্টি হওয়াতে আর্সেনিক বিষাক্ততার পাশাপাশি নতুন করে অ্যালুমিনিয়াম বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে।

আর্সেনিক-দূষিত পানির বিষক্রিয়ার বিশুদ্ধকরণ কাজে ব্যবহৃত প-াস্টিকের রালতিতে রয়েছে বিসফেনল-এ (BPA) যা মধ্যম তাপমাত্রায় (৬০° সে.) প-াস্টিক থেকে থেকে চুয়ে চুয়ে বেরিয়ে আসে। অল্প পরিমাণ BPA অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় যেমন বিকৃত জননেন্দ্রিয় এবং অস্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রোস্টেট। এছাড়াও আমাদের দেশে রান্নার কাজে প্রচুর পরিমাণে লেবু ব্যবহৃত হয়। যার ফলে অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রগুলো লেবুর অ্যাসিডিটি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং অ্যালুমিনিয়াম সাইট্রিক এসিড যৌগের বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এ রাসায়নিক উপাদান অন্ত্রের প্রাচীর ভেদ করে রক্তে চলে যায় এবং রক্তের মাধ্যমে মস্তিষ্কে গিয়ে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীদের তাই উচিত এসব ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করা। আর্সেনিক কিভাবে এলো, কারণ কি কি হতে পারে এগুলো নিয়ে বিজ্ঞানীরা বেশি সময় নষ্ট না করলেই তা মানুষের জন্যে কল্যাণকর হবে। মানুষকে সচেতন করতে হবে তারা যেন আর্সেনিকের বিষক্রিয়াকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে দৈনিক ভিত্তিতে আর্সেনিকযুক্ত পানি ব্যবহার না করেন। বর্তমানে ০.০৫ মি.গ্রা./লিটার কে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হয়েছে আর্সেনিকের জন্যে। কিন্তু এই স্টান্ডার্ড বজায় রাখলে আরও অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এর ফলে বাংলাদেশের মানুষ চর্ম বিবর্ণতা, কিরাটোসিস এবং ফুসফুস, ব-াডার ও অন্যান্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। তাইওয়ানে ড: চিয়েন-জেন চেন ১৯৮৬ সালে এবং চিলিতে ড: এলেন স্মিথ ১993 সালে এ ধরনের রোগ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এসব আবিষ্কার ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন (WHO) কে বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে স্ট্যান্ডার্ড ০.০৫ মি.গ্রা./লিটার থেকে ০.০১ মি.গ্রাম/লি-এ নামিয়ে আনতে হবে।

পটভূমিকা :

প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশ বঙ্গ অববাহিকার অংশ যা গঙ্গা নদীর পলিমাটি দ্বারা গঠিত। বাংলাদেশের বহু মানুষের জীবনের হুমকিরূপে যে আর্সেনিক দেখা দিয়েছে তা হিমালয়ের 'হার্ড রক' ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে জমতে জমতে সৃষ্টি হয়েছে।

ইতিপূর্বে আর্সেনিক মাত্রা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছিল যাতে করে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া মানবদেহ সহ্য করতে পারে। এই গ্রহণযোগ্য মাত্রা বর্তমানে বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে ০.০৫ মি. গ্রা./লিটার (50 ppb)। কিছুদিন আগ পর্যন্ত WHO কর্তৃকও এই মাত্রাই নির্ধারিত ছিল। গবেষণায় দেখা গেছে প্রাণী দেহে অল্প পরিমাণে আর্সেনিক উপকারী এবং মানুষের জন্যেও অল্প পরিমাণে আর্সেনিক উপকারী। এজন্যেই এই মাত্রা ঠিকই ছিল এতদিন, কিন্তু এখন তা ভুল প্রমাণিত হচ্ছে।

American Waterworks Association (AWWA) ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে, যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশসংস্থা EPA -এর টার্গেটিং এবং এনালাইসিস ব্রাঞ্চ প্রধান জেমস্ টাফ্টকে উদ্দেশ্য করে লিখেন আর্সেনিকের মাত্রাকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে যেন ০.০১ মি.গ্রা/লি. এর নীচে না করা হয়। AWWA তাদের যুক্তিতে বলেন এমন কোন কারণ নেই যার ফলে অল্প পরিমাণে আর্সেনিক গ্রহণে ক্ষতি হতে পারে, ফুসফুসের ক্যান্সারেরও কারণ আর্সেনিক নয়। এদিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন পরিকল্পনা করছেন ২০০3 সালের মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড ধরা হবে ০.০১ মি.গ্রা./লিটার এবং যুক্তরাষ্ট্র চিন্তা করছে এই স্ট্যান্ডার্ড ০.০০২ মি.গ্রা./লিটার করার।

ভূ-গর্ভে কিভাবে আর্সেনিক এলো?

বিজ্ঞানীরা এখন পর্যন্ত একমত নন, কিভাবে আর্সেনিক ভূ-গর্ভে এলো। বিজ্ঞানীরা যখন এ নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত- তখনই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ আর্সেনিকে মারা যাচ্ছে এবং মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা দুইটি থিওরির কথা বলছেন। এ দুটি থিওরি নিচে আলোচিত হল:

প্রথম থিওরি : ভূগর্ভে পাথরের স্তরে রয়েছে পাইরাইট (FeS_2) নামক যৌগ যার ভিতরে রয়েছে আর্সেনিক। পূর্বে এই পাইরাইট ক্ষতিকর ছিলনা। কিন্তু বর্তমানে এই পাইরাইট জারিত (অক্সিডাইজড্) হওয়াতে আর্সেনিক বের করে দিচ্ছে যা পানির স্তরে প্রবেশ করছে এবং আর্সেনিক দূষণ করে পরবর্তীতে বিষাক্ত করে ফেলছে।

প্রচুর পরিমাণে ভূ-গর্ভস্থ পানি তোলাতে জলীয় স্তরের কমবেশ হতে থাকে এবং নলকূপ বসানোর সময়ে ভূ-গর্ভের জলীয় স্তরে বাতাস ও অক্সিজেনের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এ কারণে ভূগর্ভস্থ পানির রাসায়নিক ভারসাম্য ক্রমান্বয়ে আর্সেনিক বৃদ্ধির পক্ষে চলে যাচ্ছে। এভাবে অক্সিজেন দ্বারা জারিত আর্সেনো-পাইরাইট পানিতে আর্সেনিক বিমুক্ত করে। শুধু তাই নয়, পানি এবং বাতাসের সংস্পর্শে এসে আর্সেনো-পাইরাইট উচ্চ মাত্রায় দ্রবণীয় এবং নরম হয়ে পড়ে। নলকূপে যখন পানি তোলার জন্যে চাপ প্রয়োগ করা হয় তখন নরম আর্সেনিকযুক্ত যৌগগুলো ভেঙ্গে যায় এবং বিমুক্ত আর্সেনিক পানিতে মিশে যায়। নলকূপ থেকে যত বেশি পানি তোলা হবে আর্সেনিকের পরিমাণ তত বাড়তে থাকবে। এই প্রক্রিয়া রাসায়নিকভাবে একদিকদর্শী ও অপরিবর্তনীয়।

দ্বিতীয় থিওরি : ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের সাথে রাসায়নিক ভারসাম্য বা আর্সেনিক বিমুক্ত হবার কোন সম্পর্ক নেই। প-াওস্টেসিন পরবর্তী যুগ বা সাম্প্রতিক বাংলাদেশী পলিমাটিতে দেখা যায় প্রচুর পরিমাণে অর্গানিক কার্বনের উপস্থিতি। অর্গানিক কার্বনের ক্ষয় সাধিত হবার জন্যে এবং কার্বনডাইঅক্সাইড গঠনের জন্য, অর্গানিক কার্বন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে আয়রন অক্সি-হাইড্রক্সাইড গঠন করে। এভাবে প্রাপ্ত আয়রন অক্সি-হাইড্রক্সাইড ভেঙ্গে গিয়ে আর্সেনিক বিমুক্ত হয়ে পড়ে।

মট্ ম্যাকডোনাল্ড ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভে (BGS)-এর রিপোর্ট মতে তিনটি কারণে বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ ঘটছে। কারণ তিনটি হল-

১. আর্সেনিকের উৎস থাকাতে (পলিমাটির অংশ বিশেষে আর্সেনিক রয়েছে)।

২. গতিশীলতা অর্থাৎ মবিলাইজেশন (পলিমাটি থেকে আর্সেনিক ভূ-গর্ভস্থ পানিতে যুক্ত হয়) এবং

৩. পরিবহন (প্রাকৃতিক ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক চলে যায়)।

এই যে 'আর্সেনিক সমস্যা'- সম্ভবত আর্সেনিকের বিমুক্ত হবার প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল হাজার বছর আগে। যখন পলিমাটি জমা হয়েছিল, তখন থেকেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায় তবে কেন এতদিন এ ব্যাপারে কোন কথা ওঠেনি। এর কারণ সম্ভবত: ৩০ বছর আগে যখন আর্সেনিক দেখা দিতে শুরু করে তখন মানুষ বা ডাক্তাররা এ ব্যাপারে এতটা সচেতন ছিলেন না। তখন ডাক্তাররা আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীকে ভাবতেন এক্‌জিমা বা অন্য কোন চর্ম রোগী। আর্সেনিকে আক্রান্ত অনেককে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে তাদের অনেকেরই সমস্যা শুরু হয়েছিল ১০, ১৫ বা ২০ বছর আগে। কিন্তু তারা বুঝতে পারছেন এখন। বাংলাদেশের ভূ-গর্ভস্থ পানিতে অক্সিজেন কম থাকায় 'আর্সেনো-পাইরেটের অক্সিডেশন থিওরি' আর্সেনিক বিমুক্তকরণের ক্ষেত্রে খুব বড় যুক্তি নয়। এই থিওরির বিপক্ষে আরও যুক্তি রয়েছে। আর্সেনোপাইরেটের একটি উপাদান সালফার খুব অল্প পরিমাণে রয়েছে বাংলাদেশের পলিমাটিতে। কি পরিমাণে সালফার রয়েছে তার সাথে আর্সেনিকের উপস্থিতির মাত্রার সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু আর্সেনিকের পরিমাণের সাথে আয়রনের পরিমাণের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। আয়রন এবং বাই-কার্বনেট প্রচুর পাওয়া যায় এখানকার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে। আয়রন অক্সি-হাইড্রক্সাইডের পরিমাণ কমাতে এগুলো উৎপন্ন হচ্ছে। আর্সেনিক দূষণ হওয়ার পরেও অনেক পানিসম্পদ প্রকৌশলী আরও নলকূপ খননের পক্ষে। তাদের মতে আরও গভীরের পলিমাটি আর্সেনিকমুক্ত। কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. দীপংকর চক্রবর্তির মতে, এতে আরও নতুন নতুন টিউবওয়েল আর্সেনিক আক্রান্ত হবে। উদাহরণস্বরূপ, যশোরের সামতা গ্রামের একটি গভীর কূপে আর্সেনিকের মাত্রা মাত্র ছয় মাসে ৫ গুণ বেড়ে গেছে!

খারাপ সংবাদ :

খারাপ সংবাদ হচ্ছে আর্সেনিকের ভয়াবহতা দিন দিন বেড়েই চলেছে এবং অনেক আর্সেনিকযুক্ত নলকূপকে চিহ্নিত করার বহু আগেই এসব নলকূপ হতে আর্সেনিকযুক্ত পানি উত্তোলিত হয়েছে। বাংলাদেশ জুড়ে প্রায় ৪৫ লক্ষ নলকূপ রয়েছে। এই যে ৪৫ লক্ষ নলকূপ বিদ্যমান-এর কতগুলো আর্সেনিক-দূষিত এবং কতগুলো ভবিষ্যতে দূষিত হতে পারে? এর উত্তর কারও জানা নেই। এ মুহূর্তে বিজ্ঞানীদের কাজ হবে আর্সেনিকের ভয়াবহতা কমিয়ে আনতে নিরলস কাজ করা।

আমরা জানি, আর্সেনিকের বিষাক্ততা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, এগুলো হল অক্সিডেশন অবস্থা, রাসায়নিক গঠন এবং বায়োলজিক্যাল মিডিয়াতে দ্রাব্যতা। আর বিষাক্ততার মাত্রা নিম্নলিখিতভাবে কমতে থাকে: আর্সিন অজৈব As(III) > জৈব As(III) > অজৈব As(V) > জৈব As(V) > আর্সেনিয়াম যৌগ এবং আর্সেনিকের উপাদান। As(III)-এর বিষাক্ততা As(V) -এর চেয়ে দশগুণ বেশি। বাংলাদেশে As(III) ও As(V) -দুই ধরনেরই পাওয়া যায়- এই দুই ধরনের আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করলে শারীরিক ক্ষতি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা করলেই সমস্যা সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। আমাদের দেশের মানুষকে কি আমরা এখনও আর্সেনিক বিষাক্ততার ভয়াবহতা বোঝাতে পারিনি?

WHO-এর উপদেষ্টা, ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার ড. এলেন স্মিথের মতে, ক্যান্সারে মৃত্যুর অন্যতম কারণ আর্সেনিক এবং কোন কোন স্থানে সিগারেটে মৃত্যুর হারের চেয়ে আর্সেনিকে মৃত্যুর হার বেশি। বাংলাদেশ বঙ্গীয় অববাহিকাতে অবস্থিত হওয়াতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিকের যেসব সমস্যা বিদ্যমান তা বাংলাদেশেও ভবিষ্যতে দেখা দিতে পারে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে অনেক গভীর ও অগভীর নলকূপে প্রচুর পরমাণে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে যা জনস্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক হুমকিরূপে দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বাংলাদেশে আর্সেনিকের মাত্রা/ভয়াবহতা পূর্বে যেটুকু ভাবা হয়েছিল তার চেয়েও অবস্থা অনেক বেশি উদ্বেগজনক। WHO-জানিয়েছে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হচ্ছে পানীয় জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি। এই ইস্যুকে জরুরী ভিত্তিতে মোকাবিলা করতে হবে। সেজন্য WHO অন্যান্য সংস্থা যেমন UNESCO, IAEA, UNICEF, UNIDO, FAO, WORLD BANK-এর সাথে কাজ শুরু করেছে। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে পানীয় জল আর্সেনিকমুক্ত করার পদ্ধতি দেখছেন এবং অন্যান্য পানীয় জলের উৎস সন্ধানে কাজ করছেন। কিন্তু ফলাফল আশাপ্রদ হচ্ছে না।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর আশপাশের এলাকাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত কারণ এখানে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা বেশি। আর্সেনিক-বিষাক্ততা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে আর্সেনিক যুক্ত খাবার ও পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। আর্সেনিকযুক্ত পানি পানীয় উপযোগী করার জন্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এ্যালুমিনিয়াম সালফেট (অ্যালাম)। কিন্তু এখন অ্যালাম ব্যবহারকেও নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে কারণ অ্যালুমিনিয়াম-বিষাক্ততা নিউরোলজিক্যাল সমস্যা সৃষ্টি করছে। প-াষ্টিক বোতল ও পাত্র ব্যবহারও সমস্যাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এতদিন আমরা আর্সেনিক দূরীকরণে ভুল পন্থা অবলম্বন করে আসছিলাম এবং ধারণাটাও ভুল ছিল।

ড. দীপংকর চক্রবর্তি বলেন, যেসব টিউবওয়েল আগে আর্সেনিকমুক্ত পানি উত্তোলন করত এখন তা আর দূষণমুক্ত নয়। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বেতাই গ্রামের যে সমস্ত টিউবওয়েল ২ বছর আগে আর্সেনিকমুক্ত ছিল এবং আমরা যেগুলো 'সবুজ রং' করে এসেছিলাম- এগুলোর ৯৫% এখন আর্সেনিক দূষিত।

আর্সেনিক-দূষণের আবিষ্কার :

যদিও এ ব্যাপারটা রহস্যাবৃত, তবে ধারণা করা হয় আশির দশকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে আর্সেনিক আবিষ্কৃত হয়। ১৯৮৮ সালে WHO-প্রকাশিত বুলেটিনের একটি প্রবন্ধে জানা যায় বাংলাদেশে একটি 'Technology Mission'-গঠন করা হয় যারা এখানে আর্সেনিক-দূষণ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করবে। সেই মিশন ভূগর্ভের ২০-৮০ মিটার গভীরে একটি স্তর পান যেখানে আর্সেনিক পাওয়া যায়, কিন্তু ১০০ মিটারের নিচে এ ধরনের কিছু পাওয়া যায় নি। বাংলাদেশের একজন বিজ্ঞানী যিনি NIPSOM-এ রয়েছেন তাঁর মতে ১৯৯০ সালের দিকে সরকারী পর্যায়ে আর্সেনিক প্রসঙ্গে অবহিত করা হয়।

এতদিনেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি কেন? এর কারণ হচ্ছে সরকার স্বীকার করেনি আর্সেনিকের কথা এবং ভেবেছিল এটা একটা স্থানীয় সমস্যা। নলকূপের পানি যে আর্সেনিক-দূষিত এটা স্বীকার করার অনেক আগেই ক্ষতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। কারণ দেশে প্রচলিত ধারণা ছিল ভূ-গর্ভস্থ পানি নিরাপদ। নলকূপের ব্যবহার আগে যেহেতু একটা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ ছিল, সেহেতু আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর কথা বেশি লোক জানতে পারেনি। আর যারাও বা বুঝতে পেরেছিল হয় তারা কোন গুরুত্ব দেয়নি অথবা ভুল চিকিৎসা করা হয়েছিল।

আশির দশকে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার ফলাফল দেখা দিতে শুরু হলো। বাংলাদেশের অনেক বয়স্ক লোকের সাক্ষাৎকারে জানা গেছে সত্তর দশকে তারা আর্সেনিক-আক্রান্ত রোগীর যেসব সমস্যা হয় সেগুলো দেখেছে। তাই ধারণা করা হয় বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ কূপগুলো থেকে '৭০ সাল থেকেই আর্সেনিকযুক্ত পানি ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের প্রফেসর কাজী কামরুজ্জামানের মতে সরকার ১৯৮৫ সালে আর্সেনিকের কথা জানতে পারেন। সেসময়ে অনেক লোক ভারতে চিকিৎসার জন্যে গেলে সেখানে তাদেরকে বলা হয় তারা আর্সেনিক-বিষাক্ততায় ভুগছেন। তখন গুরুত্ব না দেয়ায় আজ বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯০% যারা নিয়মিত ভূ-গর্ভস্থ পানি পান করেন তারা আরো

তাড়াতাড়ি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আর্সেনিক বিষাক্ততায় আক্রান্ত রোগী শেষ পর্যায়ে বুঝতে পারছেন তাদের চর্মে আর্সেনিকের কারণে বিপর্যয় ঘটেছে।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক:

আর্সেনিকের বিষাক্ততা নির্ভর করে রাসায়নিক গঠনের উপর ও যে মানুষের দেহে আর্সেনিক প্রবেশ করছে তার বয়স, লিঙ্গ, ডোজ এবং কতক্ষণ, কি পরিমাণ আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করল- এসবের উপরে। জৈব আর্সেনিক অজৈব আর্সেনিকের চেয়ে ১০ গুণ কম বিষাক্ত। গ্রহণকৃত আর্সেনিকের প্রায় ৫০% মূত্রের সাথে বেরিয়ে যায়, কিছু অংশ ত্বক, চুল ও নখের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যায়। জরীপে দেখা গেছে গ্রামের মানুষ যারা বেশি শারীরিক পরিশ্রম করে তারাই আর্সেনিকে বেশি মাত্রায় আক্রান্ত কারণ তারা প্রতিদিন প্রায় পাঁচ লিটার পানি পান করে থাকে যা সাধারণ পরিমাণের প্রায় দ্বিগুণ। এছাড়া তারা তাদের খাবার তৈরি করে এই আর্সেনিক-দূষিত পানি দিয়ে। আর্সেনিক-দূষিত পানি ব্যবহার করে গ্রামের লোকেরা গোসল করে, হাত-মুখ ধোয় এবং অন্যান্য ঘর-গৃহস্থালীর কাজ সারে।

পাকস্থলী ও শ্বাস-প্রশ্বাস প্রণালীর মাধ্যমে অল্প পরিমাণে নিয়মিত আর্সেনিক গ্রহণে তিন ধরনের ক্রোনিক আর্সেনিক-বিষাক্ততা ঘটে যা প্রায়ই অজ্ঞাত থেকে যায়। প্রথম অবস্থায় পেটে ও শ্বাস-প্রশ্বাসে জ্বালাপোড়া দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্বকে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং তৃতীয় পর্যায়ে বহির্ত্বকের প্রদাহ শুরু হয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে রোগী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে এবং উদাসীন/হতাশ হয়ে পড়তে পারে। দীর্ঘদিনের আর্সেনিক-বিষাক্ততায় হাইপার-কিরাটোসিস, কন্‌জাঙ্কটিভাইটিস্‌, হাইপার পিগমেনটেনশন, স্কিন-ক্যান্সার এবং গ্যাংগ্রিন হতে পারে।

আর্সেনিক-দূষণের প্রাসঙ্গিক ইতিহাস এবং অনুসরণকৃত কৌশলসমূহ ঃ

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ একই বঙ্গীয় অববাহিকাতে অবস্থিত হওয়াতে এই দুইটি এলাকা গঙ্গা নদীর পলিমাটি দ্বারা গঠিত। পশ্চিমবঙ্গে আশির দশকের মধ্যভাগে আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠে পশ্চিমবঙ্গের সরকার এবং ওখানকার দাতাগোষ্ঠী যদি আর্সেনিক সম্পর্কে অবগত থাকতে পারে, তবে কেন বাংলাদেশের সরকার এবং এখানে কর্মরত দাতাগোষ্ঠী এ সম্পর্কে তখন কিছুই জানতে পারল না?

নব্বই দশকের মধ্যভাগে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় 'Rapid Action Program' গঠন করে। এই প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৬০,০০০ গ্রামের মধ্যে মাত্র ২০০ গ্রামে জরীপ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। টিউবওয়েল সার্ভে এবং রোগী সার্ভের দায়িত্ব দেয়া হয় ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালকে। তাদের দায়িত্ব দেয়া হয় টিউবওয়েলে আর্সেনিকের মাত্রা এবং ক্রোনিক আর্সেনিক বিষাক্ততার মাত্রা নির্ধারণ করার। বাংলাদেশের সব অঞ্চলের বেশির ভাগ গ্রামের টিউবওয়েলেই আর্সেনিকের মাত্রা স্ট্যান্ডার্ডকৃত ০.০৫ মিগ্রা./লিটার-এর বেশি। খসড়া হিসেব মতে, বাংলাদেশের অর্ধেকের বেশি টিউবওয়েলই এই স্ট্যান্ডার্ড অতিক্রম করে। আর্সেনিকের মাত্রা পরিমাপের জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম 'মার্ক ফিল্ড কিট R' যা ০.০৫ মিগ্রা/লিটার-এর নিচে আর্সেনিকের মাত্রা মাপতে পারে না। তাই WHO কর্তৃক নির্ধারিত নতুন স্ট্যান্ডার্ড ০.০১ মিগ্রা/লিটার-এর উপরে বাংলাদেশের কত লোক পানি পান করছে তা জানা সম্ভব নয়। এছাড়া সন্দেহ করা হচ্ছে এই কিট 'আর্সিন' গ্যাস নিঃসরণ করে থাকে যার বিষাক্ততা আরও ভয়াবহ।

UNDP সার্ভে অনুযায়ী বাংলাদেশের ৪০% কূপ আর্সেনিক-দূষণযুক্ত। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রথম ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে আর্সেনিক সনাক্ত করে এবং ১৯৯৬ সালে নিশ্চিত করে যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রচুর গভীর ও অগভীর কূপ আর্সেনিকযুক্ত যা জনস্বাস্থ্যের জন্যে মারাত্মক ক্ষতিকর। বাংলাদেশের ৬৪টির ভেতর ৫৯টি জেলার কূপ আর্সেনিকে দূষিত। আর্সেনিকের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের খুব কমই বুঝতে পারে তাদের ক্ষতি হচ্ছে কারণ এ ধরনের ক্ষতি তারা চোখে দেখছে না। উদাহরণস্বরূপ, ঝিকরগাছাতে ব্র্যাক কাজ করছে আর্সেনিক নিয়ে। সেখানে প্রায় ১,১৩,০০০ লোক বিপদে রয়েছে আর্সেনিকের কারণে কিন্তু সেখানে মাত্র ১০৯ জন রোগী পাওয়া গেছে।

ভূ-গর্ভে আর্সেনিক পাওয়াতে পূর্বে অনেক শিল্পায়ন-দূষণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছিল। এখন কোন সন্দেহ নেই ভূ-গর্ভে আর্সেনিক থাকার পিছনে রয়েছে প্রাকৃতিক কারণ। বাংলাদেশের পলিমাটির তলানিতে আর্সেনিক রয়েছে ২-১০ মিগ্রা./কেজি (স্বাভাবিকভাবে থাকার কথা ছিল ২-৬ মিগ্রা./কেজি)। প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে এবং বাদামী বালির চেয়ে ধূসর বালিতে আর্সেনিক বেশি পরিমাণে থাকে। আহরণযোগ্য আয়রণ এবং তলানীর আর্সেনিকের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক, অ্যামোনিয়াম অক্সালেট এসিড হিসেবে দ্রবীভূত হতে পারে। এই এসিডে হাইড্রাস ফেরিক অক্সাইড ও অন্যান্য অক্সাইডও দ্রবীভূত থাকে। এ জন্য মনে হয় তলানির প্রচুর পরিমাণ আর্সেনিক শোষিত অবস্থায় থাকে। পাইরেটে আর্সেনিক রয়েছে তা এ থেকে সত্য বলে মনে হয় না।

প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া যায় ধূসর কাদামাটিতে। এছাড়াও এ কাদামাটিতে রয়েছে আয়রন, ফসফরাস ও সালফার। চাঁপাইনবাবগঞ্জে ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি কাদামাটির স্তর এবং ১৫০ মিটার নিচের স্তরের মধ্যে আর্সেনিকের পরিমাণের তেমন কোন তারতম্য দেখা যায় না। এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি সেখানে যেকারণে বলা যেতে পারে বাতাসে উড়ে এসে জমা হয়ে এখানে আর্সেনিকযুক্ত ভূগর্ভস্থ তলানীর সৃষ্টি হয়েছে। ভূগর্ভস্থ আর্সেনিকযুক্ত তলানী এবং এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহমান পানির সাথে আর্সেনিকের মাত্রার হিসাবনিকাশ মিলানো কঠিন।

মনে করা হয় যে, সালফাইড ও অক্সাইড যুক্ত খনিজপদার্থ আর্সেনিকের প্রধান উৎস। উৎসস্থলে পাইরেটের অক্সিডেশন ও তলানী পরিবহনের সময়ে দ্রবণীয় আর্সেনিক ও সালফেট বিমুক্ত হয়। সালফেট সাগরে চলে গেলেও আর্সেনিক সেভাবে যায় না বরং আয়রন অক্সাইড কলয়ডাল আকৃতির কণায় পরিণত হয় এবং বদ্বীপের নিম্নাংশে জমা হতে থাকে। তলানী পরিবহনের সময়ে আর্সেনিকযুক্ত খনিজ আলাদা হয়ে যায়। বদ্বীপের নিম্নাংশে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে তলানী জমা হয় যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বাংশে আর্সেনিক দূষণ সবচেয়ে বেশি।

গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর আশ-পাশে বেশী মাত্রায় আর্সেনিকযুক্ত পানি পাওয়ায় মনে করা হয় এখানে আর্সেনিকের অনেকগুলো উৎস রয়েছে। প-্যাওস্টেসিন আমলে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রপৃষ্ঠের পরিবর্তন হওয়াতে ডেল্টা অঞ্চলে প্রচুর তলানী পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮০০০ বছর আগে সমুদ্রপৃষ্ঠ ১০০ মিটার নিচু ছিল। তখন নদীগুলো পেরিয়ে উপত্যকায় পৌঁছে ডেল্টাতে নরম তলানী জমতে থাকে। এবং সে সময় তলানীতে দূষিত পানি জমতে থাকে। ভূ-গর্ভস্থ পানির পরিমাণ কমতে থাকা এবং আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার একটি সম্পর্ক রয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ পানি যত কমবে, আর্সেনিকের মাত্রা তত বাড়বে।

পানির pH-এর উপর ভূগর্ভস্থ আয়নর অক্সাইড-এর আর্সেনিক শোষণ ক্ষমতা নির্ভরশীল। পানির pH যখন স্বাভাবিকের কাছাকাছি (মাত্রা ৭), আয়রন অক্সাইড তখন As(V)-এর তুলনায় As(III) কে কম শোষণ করে। ভূ-গর্ভস্থ পানি কমতে থাকলে স্ফটিকীকৃত আয়রণ অক্সাইড pH মাত্রার পরিবর্তনের কারণে অতিরিক্ত হারে আর্সেনিক বিমুক্ত করবে। এছাড়াও আয়রন অক্সাইড ফসফেটকেও মুক্ত করবে। এর ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে ফসফেট, As(V)-এর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে শোষিত হতে এবং এতে আর্সেনিক-দূষণ বাড়বে। এতে করে আর্সেনিক চিকিৎসা আরও কঠিন হয়ে পড়বে।

আর্সেনিক বিষাক্ততা থেকে বাঁচতে হলে আর্সেনিকযুক্ত খাদ্য ও পানীয় পরিহার করতে হবে। এছাড়াও নদীর পানি, পুকুর, খাল-বিল, হাওড়ের

পানি ফুটিয়ে বা ফেরিক লবণ দিয়ে বিশুদ্ধ করে নিতে হবে। অ্যালুমিনিয়াম সালফেট আগে এ কাজে ব্যবহৃত হলেও এখন অ্যালুমিনিয়াম বিষাক্ত হওয়াতে ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। রাসায়নিক উপায়ে পানিকে বিশুদ্ধ করতে চাইলে তাকে ১২ ঘন্টা ধরে রাখতে হবে যাতে করে আর্সেনিক তলানীরূপে জমতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে ৩-১০ মিগ্রা/লিটার ফেরিক ক্লোরাইড ব্যবহারের মাধ্যমে ৮১-৯৬% আর্সেনিক সরানো সম্ভব।

পৃথিবী জুড়ে আর্সেনিক মুক্ত করতে ল্যাবরেটরী ও মাঠ-পর্যায়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা হয়। রাসায়নিক উপায়েই সবচেয়ে বেশি পানি আর্সেনিক মুক্ত করা হয়। পন্থাগুলো হলঃ

- আয়রন ও অ্যালুমিনিয়াম লবণ ব্যবহার
- অ্যাকটিভেটেড অ্যালুমিনা/অ্যাকটিভেটেড কার্বন/ অ্যাকটিভেটেড বক্সাইড দ্বারা আচর (adsorption) করা
- রিভার্স অসমোসিস (আস্রবণ)
- আয়ন বিনিময় এবং
- অক্সিডেশন (জারন)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পিটার ও তার সহযোগীরা একটি এন্টিডট আবিষ্কার করে যা আর্সেনিক-বিষাক্ততা প্রতিরোধে কাজ করে। এই এন্টিডট BAL (২.৩ ডাইমারকেপটো-প্রোপানল) নামে প্রচারিত। যুদ্ধে আর্সেনিকযুক্ত গ্যাসে আহতদের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে এর আবির্ভাব ঘটে। BAL -কে মলম বা সলিউশন হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আর্সেনিক-বিষাক্ততার ফলে ক্ষত/ঘায়ের চিকিৎসায় এটি কার্যকরী।

ঘনীভূত করে As(III) মুক্ত করার ক্ষেত্রে ঘনীভূতকরণের ডোজ (dose) নিয়ন্ত্রিত রাখতে হয় এবং pH-এর কোন পরিবর্তন হয় না। ৭-৫-এর নিচে pH হলে আয়রন ও অ্যালুমিনিয়ামের ঘনীভূতকরণে As(V) মুক্ত করা যায়। আয়রনযুক্ত পানি ঘনীভূতকরণ রসায়নিক কারণে সুবিধাজনক।

<u>ঘন আর্সেনিক বৈর্জ্য ও বিশুদ্ধিকরণ :</u>

আর্সেনিক বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতির ব্যবহারে সৃষ্ট ঘন আর্সেনিকযুক্ত বৈর্জ্য পদার্থ ক্ষতিকর। ঘনীভূতকরণ ও ছাকনীর পরে আর্সেনিক সরিয়ে না ফেললে তা মাটিতে মিশে গিয়ে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে চলে যেতে পারে। আশার কথা যে, আর্সেনিক গোবর, পাতা, কচুরিপানার সাথে মিশে মিথাইল এসিডে পরিণত হয় এবং বাষ্পে পরিণত হয়।

<u>আর্সেনিক বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি:</u>

বাড়িতে আর্সেনিক দূর করার বেশ কিছু সহজ প্রযুক্তি রয়েছে। কিন্তু এসব প্রযুক্তি স্থানীয় প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে এবং স্থানীয় পর্যায়ে তা কার্যকর করা গেলে তবেই তা জনসাধারণের নাগালে পৌঁছাবে।

As(III)-কে As(V)-এ অক্সিডাইজ করতে সবচেয়ে কার্যকরী ফেরিক ক্লোরাইড। As(V) কে বিশুদ্ধকরণ সহজসাধ্য বলে As(III) কে As(V)-এ রূপান্তরিত করা হয়। ঘনীভূতকরণ/ফিল্ট্রেশন (C/F), As(V)-দূরীকরণে কার্যকরী প্রক্রিয়া। ঘনীভূতকরণের ধরন ও ডোসেজ (dosage)-এর উপর প্রক্রিয়ার সাফল্য নির্ভর করে। pH যদি খুব কম বা বেশি হয়, তবে পদ্ধতির কার্যকারিতা কমে যায়। লাইম সফটেনিং (Lime Softening)-এর মাধ্যমে আর্সেনিক দূর করা সম্ভব।

আয়ন বিনিময় (Ion Exchange) কার্যকরভাবে আর্সেনিক দূর করে। এ ছাড়া, সালফেট, TDS- সেলেনিয়াম, ফ্লোরাইড এবং নাইট্রেট আর্সেনিকের সাথে প্রতিযোগিতা করে সহায়তা করে দীর্ঘ সময় ধরে। রিভার্স অসমোসিস (RO), আদর্শ চাপে ৯৫% সাফল্যের সাথে আর্সেনিক দূর করে।

ইলেক্ট্রোডায়ালিসিস রিভার্সাল (EDR) আর্সেনিক দূরীকরণে ৮০% সফল। এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে EDR-এর ফলে পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা ০.০২১ মিগ্রা/লিটার থেকে কমে গিয়ে ০.০০৩ মিগ্রা/লিটারে দাঁড়িয়েছে। ন্যানোফিল্ট্রেশন (NF)-এর মাধ্যমে ৯০% আর্সেনিক দূর করা সম্ভব।

<u>প্রতিশ্রুতিশীল প্রযুক্তিসমূহ :</u>

লবনপানি (ব্রাইন সলিউশন) রিসাইকেলের আয়ন বিনিময় : ইউনিভার্সিটি অফ হিউস্টন (ক্লিফোর্ড), ম্যাক্‌ফার্ল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়া এবং অ্যালব্যুকার্কি, নিউমেক্সিকোতে গবেষণায় দেখা গেছে আয়ন বিনিময়ে আর্সেনিকের মাত্রা ০.০২ মিগ্রা./লিটারে নামিয়ে ফেলা যায় যদিও সালফেটের মাত্রা বেশি হতে পারে যেমন ২০০ মিগ্রা./লিটার। সালফেট অনেকক্ষণ কার্যকর থাকে এবং সালফেট যত বেশি থাকে আর্সেনিক ভেঙ্গে যাওয়া তত সহজ হয়। গবেষণায় দেখা গেছে একই লবনপানি ২০ বার ব্যবহার করা যায়। ব্রাইন রিসাইকেল ব্যবহারে বর্জ্য কম হয় এবং খরচও কম হয়।

ইউনিভার্সিটি অফ হিউস্টন (ক্লিফোর্ড) এবং অ্যালব্যুকার্কি, নিউ মেক্সিকোতে পাইলট স্টাডিতে দেখা গেছে, ডাইরেক্ট ফিল্ট্রেশন আয়রন (অতিরিক্ত) ঘনীভূতকরণে As(V)-এর মাত্রা ০.০২ মিগ্রা./লিটার এর নিচে নেমে আসে। এক্ষেত্রে প্যারামিটারসমূহ হল আয়রন ডোজ (dose), শক্তির মিশ্রতা, ডিটেনশন (detention) সময় এবং pH।

আয়রন ঘনীভূতকরণ/ফিল্ট্রেশন এবং আয়রন (অতিরিক্ত) ঘনীভূতকরণ ডাইরেক্ট ফিল্ট্রেশনে As(V) দূরীভূত হয়। উৎসস্থলের পানি যাতে প্রাকৃতিকভাবে আয়রন এবং/অথবা ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে তা থেকে প্রচলিত Fe/Mn প্রক্রিয়াতে আর্সেনিক দূর করা সম্ভব। এ প্রক্রিয়ায় পানি হতে আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিজ দূর করায় আর্সেনিকও দূরীভূত হয়।

<u>সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা :</u>

আমাদের কি ভবিষ্যতকে সামনে রেখে কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা রয়েছে? এখন গ্রামে যে ছোট 'Make-Shift' সিস্টেম রয়েছে সেগুলো কি গ্রামবাসীরা ব্যবহার করবে যখন NGO-কর্মীরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে! গ্রামে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া সত্যিই দুষ্কর এবং যদি তাদের বিশুদ্ধ পানি দেয়া না যায় তারা হয়ত আর্সেনিকযুক্ত পানিই খেতে থাকবে।

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের ইচ্ছাগুলো কি এবং কতটুকু আশা করছি? গ্রামে 'কেন্দ্রীয় সিস্টেম' থেকে পানি সরবরাহ বাস্তবসম্মত নয় কারণ এতে প্রচুর খরচ হবে যা আমরা বহন করতে পারব না। মেক্সিকো এবং মালয়েশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমরা ছোট 'কমিউনিটি সিস্টেম (Community System) বা 'Water Station' তৈরি করতে পারি যেখান থেকে গ্রামে পানি সরবরাহ করা হবে।

<u>আর্সেনিকের লক্ষণসমূহ :</u>

জনসাধারণকে আর্সেনিক-দূষণ এবং আর্সেনিক-বিষাক্ততার ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে হবে। গ্রামের স্বাস্থ্য ক্লিনিকে আর্সেনিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে। গ্রামবাসীকে জানাতে হবে যে আর্সেনিকে আক্রান্ত গর্ভবর্তী মা আর্সেনিকে আক্রান্ত সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। তবেই তারা সচেতন হবেন।

জনসাধারণকে বলতে হবে যে, খুব অল্প মাত্রায় আর্সেনিক গ্রহণেও তারা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে পারেন কিন্তু তারা হয়ত টেরই পাবেন না। আর যখন বুঝতে পারবেন তখন হয়ত অনেক দেরী হয়ে যাবে।

আর্সেনিক-বিষাক্ততার রয়েছে বেশ কিছু পর্যায়, সেগুলো হল :

প্রি-ক্লিনিক্যাল (Preclinical) : রোগীর দেহে কোন লক্ষণ দেখা না গেলেও প্রস্রাব বা কোষ পরীক্ষাতে আর্সেনিক ধরা পড়ে।

ক্লিনিক্যাল (Clinical) : এ অবস্থাতে চামড়াতে বিভিন্ন পরিবর্তন দেখা যায়। চামড়া কালো (মেলানোসিস) হওয়া সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণ, হাতের তালুতেও এমন হতে পারে। কালো দাগ দেখা যায় বুকে, পিঠে, মাড়িতে। Oedema অর্থাৎ হাত ও পায়ের পাতা ঘামতে থাকা। আরও মারাত্মক লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে কিরাটোসিস (Keratosis) অথবা তালুতে

(২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মূত্র পরীক্ষা ভিত্তিক আর্সেনিকের চিকিৎসা

মোহাম্মদ আলাউদ্দীন

সিরাজদিখান, মুন্সিগঞ্জের ২৫ বছর বয়স্ক আসলাম শেখ তার বাঁ হাতের পচন ধরা ক্ষতটি আমাকে দেখাতে দেখাতে বলে উঠলো, "আমার বইনেরও এই রকমই ঘাও আছে স্যার।"

গেল কয়েক বৎসর ধরে সে এমন এক টিউবওয়েল-এর পানি খেয়েছে যা ছিল প্রচন্ডভাবে আর্সেনিক দুষ্ট। আমি ও ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালের কয়েকজন চিকিৎসক ২০০১ সালের জানুয়ারি মাসে মুন্সিগঞ্জের মানুষের ওপর আর্সেনিকের প্রকোপ সরেজমিনে পরীক্ষা করতে যাই। সিরাজদিখান মুন্সিগঞ্জের একটি ছোট জায়গা। সেখানকার এক বাসিন্দা মহসিন কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো "স্যার আমাগো গ্রামের আরো কিছু মাইনষের এইরকম ঘাও আছে"। এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ আজ আর্সেনিক নামক বিষে আক্রান্ত। এই বিষের নানা উপসর্গ (Arsenicosis) দেখা দিচ্ছে আক্রান্ত মানুষের গায়ে। আসলাম শেখের বাবা-মা এই বিষক্রিয়ায় মারা গেছে। তার ৩০ বৎসর বয়স্ক বোন ও তার ৮ বৎসরের মেয়েটির গায়েও বিষাক্ত ঘা (Keratosis) পাওয়া গেছে।

২০০১ সালের জুলাই মাসে আমিও ICDDRB-এর একটি চিকিৎসক দল হাজীগঞ্জের বোলিয়া গ্রামেও মাত্র দুই ঘন্টায় ৫৩ জন মানুষের গায়ে এই উপসর্গ খুঁজে পেয়েছি। এই ৫৩ জন মানুষের মধ্যে একটি ২ বৎসরের বাচ্চাও আছে। যার সমস্ত গা আর্সেনিকের বিষাক্ত ক্ষতে বিক্ষত ছিল (Diffused Melanosis)।

ছোট-বড় কেউই আর্সেনিকের বিষাক্ত থাবা থেকে রেহাই পায়নি। প্রায়শঃই দেখা যায় কোন কোন পরিবারের সবাই আক্রান্ত। দুঃখের বিষয় এই যে তাদের অনেকেই জানে না যে তারা আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত।

উন্নত দেশে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর আর্সেনিক দ্বারা দূষিত হওয়া কোন নতুন ঘটনা নয়। বর্তমানে এটাই পৃথিবীর সবচাইতে আলোচিত পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়। বাংলাদেশের আগে চিলি, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র, মঙ্গোলিয়া, হাঙ্গেরী, নিউজিল্যান্ড, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্য জায়গায় মাটির নীচের পানিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। কিন্তু কোথাও বাংলাদেশের মত এত বেশি সংখ্যক লোক একসাথে আক্রান্ত হয় নি। বাংলাদেশ এই পরিবেশ দূষণ নিরোধীকরণে একেবারেই প্রস্তুত নয়। যদিও বহু পরিবেশ বৈজ্ঞানিকের ও পরিবেশ উৎসাহীদের মতে বাংলাদেশের বর্তমান আর্সেনিক আক্রান্ত জনসংখ্যা শুধুমাত্র বিশাল বরফখন্ডের অগ্রভাগ। যদি বাংলাদেশে এই মাত্রায় জনগণ আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করতে থাকে তাহলে আগামী বৎসরে হাজার হাজার লোকের শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ক্যান্সার দেখা দেবে। এটাই সবচাইতে ভয়ানক কথা। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে বাংলাদেশের আগে আর কোথাও এত বড় জনসংখ্যা আর্সেনিকের বিষাক্ত থাবার কবলে পড়েনি।

বাংলাদেশ পরিবেশ বিষয়ক দপ্তরের নির্দেশানুযায়ী খাবার পানিতে প্রতি লিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিক থাকতে পারবে না। বর্তমানে ৮০ মিলিয়ন লোক এমন পানি খাচ্ছে যাতে আর্সেনিকের মাত্রা এই পরিমাণের অনেক উর্ধ্বে। ৩৫ মিলিয়ন শিশুর আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হবার প্রবল সম্ভাবনা। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞরা খাবার পানিতে প্রতি লিটারে ৫০ মাইক্রোগ্রামের পরিবর্তে ১০ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক গ্রহণযোগ্য করার নতুন নীতিমালা তৈরির ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছেন।

কুষ্টিয়া, কুমিল-া, চাঁদপুর, নোয়াখালী এবং বরিশালে আর্সেনিকের মাত্রা প্রতি লিটার পানিতে ৬০০ থেকে ৩২০০ মাইক্রোগ্রাম। তবে কোন কোন জায়গায় পানিতে প্রতি লিটারে ৪৭২০ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক পাওয়া গেছে।

কয়েকশ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক যুক্ত পানি পান করলেই শরীরের বিবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ক্যান্সার দেখা দেয়। মূত্রথলি, ফুসফুস ও চর্মের ক্যান্সারই সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্যান্সার ছাড়াও ম্যালানোসিস ও ক্যারাটোসিস পৃথিবীর বহু জায়গার অধিবাসীদের মধ্যে দেখা গেছে। তবে বাংলাদেশের মত এত অধিক সংখ্যক লোক আর কোথাও আক্রান্ত হয় নি।

অজৈব আর্সেনিক যুক্ত ভূগর্ভস্থ পানি দীর্ঘদিন এক নাগাড়ে পান করলে শরীরে আর্সেনিকের দীর্ঘস্থায়ী (chronic disease) উপসর্গ দেখা দেয়। একবার অজৈব আর্সেনিক পানির সাথে খেলে তার কিছুটা মূত্র, চুল ও নখ থেকে নিঃসৃত হয়ে যায়। যে পরিমাণ আর্সেনিক শরীরে থেকে যায় তা ফুসফুস, যকৃত, বৃক্ক ও অস্থিতে জমা থাকে।

মানব দেহ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ধাতু (trace metal) হতে বিষাক্ত উপকরণ অপসারণ করতে সক্ষম। মানুষের শরীরে অজৈব আর্সেনিক যেমন আর্সেনিক ও আর্সেনাইট ভেঙ্গে জৈব আর্সেনিকে পরিণত হয়। এই প্রাণরসায়ন প্রতিক্রিয়ার শেষ উপাদান MMAA (Mono-Methyl Arsorous Acid) ও DMAA (Di-Methyl Arsenic Acid) সরাসরি মূত্র দ্বারা অপসারিত হয়। MMAA ও DMAA যকৃতে উৎপন্ন হয়। এই প্রাণরসায়ন প্রতিক্রিয়াই শরীরে আর্সেনিকের মূল বিষাক্ত উপকরণ অপসারণ পদ্ধতি। TMAO, আরসেনোবেটাইন, আরসেনোকোলিন ও শরীরে উৎপন্ন হয়। এগুলোকে বলা হয় আরসেনো শর্করা (Arseno Sugar)। এমনকি একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের প্রাণরসায়ন প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাও এক এক রকমের। যে সদস্যের এই ক্ষমতা যত বেশি প্রখর সে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া হতে তত নিরাপদ।

এই একই কারণে আর্সেনিক বিষাক্ত পানি দীর্ঘদিন পান করার পরও একই পরিবারের কোন সদস্যের কোনই উপসর্গ দেখা দেয় না অথচ অন্য কোন সদস্যের শরীরে ক্যান্সার পাওয়া যায়।

বিশ্বাস করা হয় যে ফোলেট, ভিটামিন B6, ভিটামিন B12 এবং কোলিনযুক্ত খাবার মানুষের শরীরের প্রাণরসায়ন প্রতিক্রিয়া পদ্ধতিকে

(২৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক
প্রবাসীরা কি করছেন?

সাবির মজুমদার

ভূমিকা :

নদী-নালার দেশ বাংলাদেশ। তেরো কোটি মানুষ। ২২০টি নদী। পানির অভাব নেই। বর্ষার অঝোর বর্ষণ ও নদীর অনাব্যতা এখন জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশে অকাল বন্যা আর মাঝে মধ্যে সার্বক্ষণিক বন্যার খবর এখন আর খবর নয়।

দু'একটা শহরে এলাকা বাদ দিলে ষাটদশক পর্যন্ত পুকুর আর নদীর পানি দিয়েই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন পানীয় জল, রান্না-বান্না, গোসল ও ধোয়া-মোছার কাজ করত। কিন্তু নিয়মিত মৌসুমী ও দীর্ঘস্থায়ী বন্যার কারণে বাংলাদেশের গ্রামীন জনপদে ষাট দশক পর্যন্ত ডায়রিয়া, কলেরার মহামারী লেগেই থাকত। কাজেই জীবাণুমুক্ত পানীয় জলের জন্য এলো পেটের যাবতীয় রোগ-নিরাময়ী টিউব ওয়েলের পানি। সে সাফল্য আর আধুনিকতার দিব্যদূত হিসেবে দেখা দিল ভ্রম্যচারী শান্তির দূত ইউনিসেফ।

বাংলাদেশে মানুষ আবার শান্তিতে ঘুমানোর সুযোগ পেলো। কিন্তু দুর্ভাগা এদেশ আর এদেশের মানুষ। একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের বাঙালীরা দখলদার পাকিস্তানী লড়াকু যোদ্ধাদের পানিতে মেরেছিল বটে। কিন্তু এবার সেই পানিতে পুরো জাতি নিজেই মরতে বসেছে।

সমস্যার বিস্তার :

সারা বাংলাদেশের পঞ্চাশ লক্ষ টিউব ওয়েলের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি এখন উচ্চমাত্রার আর্সেনিক দ্বারা দূষিত বলে পরীক্ষিত। আর্সেনিক একটি মৌলিক রসায়নিক দ্রব্য যা ভূগর্ভস্থ মাটি ও অন্যান্য জটিল রসায়নিক ও ভৌগলিক দ্রব্যাদির সাথে হাজার বছর যাবৎ শান্তিতে সহাবস্থান করে আসছে।

সমস্যা হলো এই মৌলিক রসায়নিক পদার্থ আর্সেনিকের দুটো অজৈব রূপই (As(III) এবং As(V)) সহজে মাটি চুইয়ে পানির সান্নিধ্যে আসতে পারে এবং পানিতে আরো সহজে মিশে যেতে পারে। আরো বড় সমস্যা হলো আর্সেনিক একটি বর্ণহীন ও নিঃশব্দ আততায়ী। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংগঠন WHO-এর ভাষ্য পানীয় জলে যদি ১০ ppb (parts per billion) অর্থাৎ প্রতি শতকোটিতে ১০ ভাগ অর্থাৎ প্রতি লিটারে ১০ মাইক্রোগ্রাম আর্সেনিক থাকে তাহলে সে পানি খাবারের অযোগ্য। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশ সরকার এখনো ৫০ পিপিবিকে গ্রহণযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ধারণ করেছে, যা কিনা আন্তর্জাতিক সুপারিশকৃত সীমা অপেক্ষা ৫ গুণ বেশী।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত, বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত আর্সেনিক স্ট্যান্ডার্ড, বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৫৯টিই আর্সেনিকে আক্রান্ত। শুধু চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাগুলো এ আক্রমণ থেকে এখনো মুক্ত। আক্রান্ত জেলাগুলোর টিউবওয়েলের পানিতে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা এককে জায়গায় এককে রকম। মারাত্মক রকম দূষণের শিকার হলো দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলো। বৃহত্তর নোয়াখালী, কুমিল-া, ফরিদপুর এবং সিলেটের বিস্তীর্ণ এলাকার ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ এখন অদৃশ্য আর্সেনিকের মরণ ছোবলের আওতায়। এক জরিপে প্রকাশ, চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলা এবং নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ উপজেলার প্রায় ৯৯ ভাগ টিউবওয়েলের পানিই এখন আর্সেনিকে দুষিত।

প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া :

আশির দশকের মাঝামাঝি বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলো থেকে আর্সেনিক দূষণের খবর প্রথম আসে। এ ব্যাপারে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীপংকর চক্রবর্তির গবেষণা লব্ধ ফলাফলকে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারকরা তখন পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। অধ্যাপক চক্রবর্তীর সক্রিয় সহায়তায় ঢাকা কম্যুনিটি হাসপাতালের ড. কাজী কামরুজ্জামান ও ড. শিবতোষ রায় নব্বই দশকের শুরুতে বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণের প্রমাণ উপস্থাপন করেন। তাঁদের কপালেও জোটে ভ্রুকুটি আর অনাকাঙ্খিত রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক চাপ। ভাবটা ছিল- এত সমস্যার দেশে আরেকটা সমস্যা যোগ না করলেই কি নয়!

আর্সেনিক পানিতে দ্রবীভূত থাকার কারণে সাধারণভাবে বর্ণ, গন্ধ ও স্বাদে এর উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। WHO-এর আর্সেনিক স্ট্যান্ডার্ডে (১০ পিপিবি) পানি একাধারে পান করতে থাকলে ১০-১৫ বছরের মাথায় সাধারণ স্বাস্থ্যের অধিকারী বয়স ও লিঙ্গ নির্বিকারে যে কোনো মানুষ চর্ম রোগ ও পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হতে বাধ্য। তবে শিশু ও মহিলারা এর শিকার হন একটু তাড়াতাড়ি।

বাংলাদেশে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় চর্মরোগ, ক্যান্সার আর বিকলাংগ হবার খবর, সংসার ভেঙ্গে যাবার, স্কুল থেকে শিশু রোগীদের বিতাড়নের খবর এখন অহরহ। শুরুতে অনেকে আর্সেনিকের বিষক্রিয়াকে সংক্রামক ব্যাধী হিসেবে ভুল ভাবে আখ্যায়িত করে। অনেকে আর্সেনিকের রোগীদের কুষ্ঠরোগী হিসেবে অপপ্রচার করেছিল। গ্রামাঞ্চলের অর্ধ শিক্ষিত মোল-ারা একে 'আল-াহর গজব' বলে প্রচারণা করেছিল।

১৯৯৩ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জের একটি টিউবওয়েলের পানিতে প্রথম আর্সেনিকের প্রকোপ সনাক্ত করা হলেও এখন প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন জনপদ থেকে একই খবর আসছে। বাদ শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম। এতে সাধারণ নিম্নস্তরের প্রশাসনে কিছুটা টনক নড়লেও ক্ষমতার প্রভাব বলয়ে কিংবা সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারকের মধ্যে টনক নড়ার লক্ষ্য শূন্যের কোঠায়।

WHO-এর গ্রহণযোগ্য আর্সেনিক স্ট্যান্ডার্ড ১০ পিপিবি আর বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্য স্ট্যান্ডার্ড ৫০ পিপিবি হলেও বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে এলাকায় আর্সেনিকের মাত্রা ২০০ পিপিবি। কিছু কিছু এলাকায় এর মাত্রা ২০০০ পিপিবিকেও ছাড়িয়ে গেছে। শেষোক্ত এলাকাগুলোকে হিসেবে না ধরেই বলা চলে যে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ অর্থাৎ চার থেকে পাঁচ কোটি লোক নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

নীতিনির্ধারনী ব্যর্থতা :

তাহলে বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকরা এতো নির্বিকার কেন?

রাজনীতিবিদদের সমস্যা তালিকায় আর্সেনিক আছে বলে বোঝা যায় না। ঢাকা চট্টগ্রামের পানি তুলনামূলক বিচারে এখনো আর্সেনিক মুক্ত বলে রাজনীতিবিদ আর নীতি নির্ধারকরা ধরে নিয়েছেন যে, তাঁরা পার পেয়ে যাবেন। এমন অথর্ব আর উদাসীন নেতৃত্ব বাংলাদেশের মত একটি আধা-ঘুমন্ত জাতিকেই মানায়!

ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ পাশ্চাত্যে কোন নতুন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, হাঙ্গেরী, যুক্তরাজ্য, চিলি, আর্জেন্টিনা, তাইওয়ান, মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড ও মঙ্গোলিয়াতে এ সংকট ধরা পড়েছে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মত অতি সম্প্রতি নেপালেও এ দূষণ ধরা পড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের বর্তমান সংকট ব্যাপকতার দিক থেকে আগের যে কোন আর্সেনিক সংকটকে ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশের পাঁচ কোটি সাধারণ মানুষ হিরোশিমা আর নাগাসাকির পারমাণবিক বোমার চেয়েও খারাপ অসংখ্য বোমার ওপর বসে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। এদের স্বাভাবিক মৃত্যুর নিশ্চয়তা দেবে কে?

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে ষাটের দশকে যখন তাইওয়ানে আর্সেনিক সমস্যা ধরা পড়ে ইউনিসেফ এ ব্যাপারে ওয়াকেবহাল থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে মিলিয়ন মিলিয়ন টিউবওয়েল বসায় আর্সেনিক সংক্রান্ত কোন ঘণ্টাধ্বনি না বাজিয়ে। ইউনিসেফ এখন জবাব দেবে কি? জেনে-শুনে ডায়রিয়া, কলেরার অকাল মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে একটা ছায়াহীন কায়াহীন মৃত্যুদূতের দিকে আমাদের ঠেলে দিয়েছে কেন? বাঙালীর অন্তত ৩০-৪০ বছর কলেরামুক্ত জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করেছিল, এই যা।

ব্রিটিশ জিওলজিক্যাল সার্ভের ১৯৯৯ সালের একটি দীর্ঘ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের ৯৯ ভাগ টিউবওয়েল ভূ-গর্ভে মাত্র ১০০ মিটার কিংবা আরো কম গভীরে প্রোথিত। এগুলোকে বলা হয় অগভীর কূপ কিংবা শ্যালো টিউবওয়েল। অগভীর কূপগুলোর ৩৫ শতাংশে আর্সেনিকের প্রকোপ লক্ষ্যণীয়। অন্যদিকে গভীর নলকূপ কিংবা ডিপ টিউবওয়েলে (২০০ মিটারের বেশী) এর প্রকোপ নেই বললেই চলে। তবে ভুল করলে চলবে না যে গভীর নলকূপগুলোর একশ ভাগই আর্সেনিক মুক্ত নয়। আবার একথাও সত্য যে সময়ের সাথে পাল-া দিয়ে কোন কোন এলাকায় পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে চলেছে।

ভূ-প্রাকৃতিক গড়নের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম, বরেন্দ্রভূমি ও মধুপুর এলাকা তুলনামূলক বিচারে এখনো আর্সেনিক মুক্ত। তবে এখানে গভীর কিংবা গভীরতর নলকূপ বসালে ইতিহাস ভিন্নতর হবার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

<u>দূষণের উৎস :</u>

হাজার বছরের ভূ-প্রাকৃতিক গড়নই আর্সেনিক দূষণের মূল উৎস হলেও শত বছরের আধুনিকায়নও এ জন্য কিঞ্চিৎ দায়ী। শিল্পায়নের কারণে যে উৎসগুলো আর্সেনিক দূষণের জন্য দায়ী সেগুলো হলো রসায়নিক সার, কীটনাশক শিল্প বর্জ্য, মাইনিং এবং জ্বালানি কাঠের ব্যাপক ব্যবহার। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ উৎসগুলো অতি সামান্য। তবে এখানে না বললেই নয় যে, কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে ভূগর্ভস্থ পানি সেচনের ফলে এবং শুকনো মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির উচ্চতা ৫ থেকে ১০ মিটার কমে যাবার কারণে পানির জারণ-বিজারণের ভারসাম্যহীনতা ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

একবিংশ শতাব্দীতে ছোট হয়ে আসা বিশ্বে শিল্পোন্নত দেশগুলো বিশেষ করে একমাত্র সুপার পাওয়ার আমেরিকা এবং এদেশে বাড়ন্ত বাঙালী পড়শীদের করণীয় কি? ভুলে গেলে চলবে না যে, শিল্পায়ন ও আধুনিকায়নের কারণে এই আর্সেনিক দুর্যোগের দায়ভার আন্তর্জাতিক পল-ীর সবাইকে কমবেশী বইতে হবে। নইলে আন্তর্জাতিক দুর্ভোগ বাড়বে বৈ কমবে না।

<u>প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভূমিকা :</u>

প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাজীবীদের উদ্বেগ, উৎসাহ ও নিরলস গবেষণার কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ সরকার দুটোরই কিছুটা হলেও টনক নড়তে শুরু করেছে। বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষণ সমস্যা নিয়ে হাতেগোনা যে কটি সংগঠন সংঘবদ্ধ কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে এসেছে তার মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ কেমিক্যাল এন্ড বায়োলজিক্যাল সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা (বাকবাসনা), আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড আর্কিটেক্টস (এএবিইএ), আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি এবং অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ-আমেরিকান ফাউন্ডেশন ইনক (বাফি)।

বাকবাসনার উদ্যোগে ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নিউইয়র্কের ওয়াগনার কলেজে দুদিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য 'বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক : পৃথিবীর গভীরতম আর্সেনিক দুর্যোগ'। চারটি সেশনে বিভক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, কানাডা ও সুইডেন থেকে আগত আর্সেনিক বিশেষজ্ঞরা প্রায় ৩০টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

নিউইয়র্কের আন্তর্জাতিক আর্সেনিক সম্মেলনের সফল উদ্যোক্তা ও আয়োজকদের অন্যতম ছিলেন বাকবাসনা বাংলাদেশ বিষয়ক উপকমিটির চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আলাউদ্দিন (নিউইয়র্ক) ও বাকবাসনার বিদায়ী সভাপতি ড. সাবির মজুমদার (ক্যালিফোর্নিয়া)। উলে-খযোগ্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ড. দীপংকর চক্রবর্তী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা), ড. এল্যান স্মিথ (ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলে), ড. উইলার্ড শ্যাপেল (ইউনিভার্সিটি অব কলোরেডো, ডেনভার), ড. নিকোলাস নিকোলেইডিস (ইউনিভার্সিটি অব কানেকটিকাট, স্টরস), ড. বিভূধেন্দ্র সরকার (ইউনিভার্সিটি অব টরন্টো), ড. এল্যান ওয়েলস (ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভে), ড. আমির হোসেন খান (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), ড. শিবতোষ রায় (ঢাকা কম্যুনিটি হাসপাতাল), ড. প্রসূন ভট্টাচার্য (রয়েল ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি, সুইডেন), ড. মোহাম্মেদ আলাউদ্দিন (ওয়াগনার কলেজ, নিউইয়র্ক), ড. আবুল হুস্যাম (জর্জ ম্যাসন ইউনিভার্সিটি, ভার্জিনিয়া), ড. দলিলুর রহমান (ক্লারিয়েন্ট কর্পোরেশন, নিউ জার্সি) এবং গৌরিশংকর ঘোষ (ইউনিসেফ)। সারগর্ভ ও প্রাণবন্ত আলোচনার এক পর্যায়ে ইউনিসেফ প্রতিনিধি গৌরিশংকর ঘোষ আর্সেনিকের মত আন্তর্জাতিক সংকটে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর দায়িত্ব ও ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেন।

নিউইয়র্কের আন্তর্জাতিক আর্সেনিক সম্মেলনের খবর আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির সাপ্তাহিক প্রকাশনা কেমিক্যাল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং নিউজে ফলাও করে প্রকাশ করে। সম্মেলনে গৃহীত ১৬টি সুপারিশমালা আন্তর্জাতিক আলোচনায় গুরুত্ব অর্জন করে :

১. আর্সেনিক মুক্ত পানি সরবরাহের জন্য জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. যথা শীঘ্র ভূগর্ভস্থ আর্সেনিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ উৎস উদঘাটন।

৩. বাংলাদেশের ৫০ লক্ষ টিউবওয়েলের সবগুলোতে যথাযথভাবে আর্সেনিক পরীক্ষা করে উচ্চমাত্রার টিউবওয়েলগুলো সীলকরণ।

৪. ভুল তথ্য প্রদানকারী আর্সেনিক চিহ্নিত করার কিট বাজেয়াপ্তকরণ।

৫. গ্রাম পর্যায়ে সঠিক তথ্য সরবরাহ ও শিক্ষার মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের প্রতি আর্সেনিকের হুমকি এবং আর্সেনিক রোগ যে সংক্রামক নয় তার সঠিক ব্যাখ্যা দান।

৬. বাংলাদেশের সব হাসপাতালে আর্সেনিক রোগীর চিকিৎসা ও পুষ্টির ব্যবস্থাকরণ।

৭. আর্সেনিক রোগীদের নখ ও চুল সংগ্রহকারী গবেষক মাঠকর্মীরা যাতে রোগীদের কাছে গবেষণার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা ও ঠিকানা রেখে যায় তা নিশ্চিত করণ।

৮. বাংলাদেশের পানি সরবরাহের মান পর্যবেক্ষণ ও রক্ষাকারী সরকারী প্রশাসনগুলো একত্রীকরণ ও দুর্যোগের মাত্রা নির্ণয়করণ।

৯. ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে অন্যান্য উৎস যেমন বৃষ্টির পানি ও ভূপৃষ্ঠের পানির দিকে মনোযোগ দান।

১০. আর্সেনিক ও অন্যান্য ক্ষতিকর দ্রব্যাদির দূরীকরণ প্রণালী অল্প দামে সহজলভ্যকরণ।
১১. বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্য আর্সেনিক স্ট্যান্ডার্ড ১০ পিপিবিতে পুনঃনির্ধারণ।
১২. স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে সুপেয় ও অপেয় পানির সংস্থাপন।
১৩. জাতিসংঘের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার আপাত অসংগঠিত আর্সেনিক কর্মকাণ্ডের মানোন্নয়ন।
১৪. বাংলাদেশের পানি সংক্রান্ত সমস্যাসমূহের সমাধানে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাসমূহের উপর নির্ভরতা সংকোচন।
১৫. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সঠিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা উন্মোচন এবং প্রবাসী বাংলাদেশী বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
১৬. বাংলাদেশ সরকারের আর্সেনিক বিষয়ক কর্মকান্ডে যুগোপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

আমেরিকান এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশী ইঞ্জিনিয়ার এন্ড আর্কিটেক্টস, সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া চ্যাপ্টারের উদ্যোগে দ্বিতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে লসএঞ্জেলেসের অদূরে লয়োলা মেরীমাউন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিলো 'পানযোগ্য পানির ভেতর আর্সেনিকের প্রভাব'। আর্সেনিকযুক্ত পানি কিভাবে মানুষকে অকাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে তার উপরে বিষদ আলোচনা করেছে তিনজন আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি। তারা ছিলেন ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কল্যার অধ্যাপক এ্যালেন স্মীথ, ক্যালটেক এর পরিবেশ প্রকৌশলের অধ্যাপিকা জেনেট হেরিং এবং বাংলাদেশ কেমিক্যাল এন্ড বায়োলজিক্যাল সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার তৎকালীন উপদেষ্টা ড. সাবির মজুমদার। অধ্যাপক এ্যালেন স্মীথ চিলি, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে বলেন, গত ১০ বছরে আর্সেনিকের কুপ্রভাবের উপর যুগান্তকারী তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। তাইওয়ান, চিলি, আর্জেন্টিনা এবং অন্যান্য দেশে অসংখ্য মৃত্যুর কারণ আর্সেনিক বলে তিনি উলে-খ করেন। আর্সেনিকের কারণে চর্ম, ফুসফুস ও মূত্রনালীর ক্যান্সারের কথাও উলে-খ করেন। আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় চিলিতে প্রতি দশজনে একজনের মৃত্যুর কথাও বলেন। বাংলাদেশে আর্সেনিকজনিত মৃত্যুর হার আরো বেশি হবে বলে তিনজন বক্তাই একমত পোষণ করেন। এখানে উলে-খযোগ্য যে, অধ্যাপক এ্যালেন স্মীথ দীর্ঘদিন যাবৎ WHO-এর আর্সেনিক বিষয়ক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে আসছেন।

এএবিইএ টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান ড. আহমেদ বদরুজ্জামানের সভাপতিত্বে দীর্ঘ প্যানেল আলোচনায় নীচের নয়টি বিষয়ে সবাই একমত পোষণ করেন :
১. আর্সেনিক রোগীর সঠিক চিকিৎসা এখনো অজানা।
২. শরীরে আর্সেনিকের মাত্রা প্রস্রাব থেকে নির্ধারণ করা হয়।
৩. একজন আর্সেনিক রোগী কতদিন যাবৎ আর্সেনিকে আক্রান্ত তা নির্ধারণের উপায় অজানা।
৪. আর্সেনিকমুক্ত পানি সেবনই সর্বোতম উপায়।
৫. ফুটানো পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা কমে না বরং বেড়ে যায়; আর্সেনিক দুষিত পানি রান্নাবান্নাতে ব্যবহার একই কারণে খারাপ।
৬. উপযুক্ত পরিমাণে ফিটকিরি ও বি-চিং পাউডারের ব্যবহার আর্সেনিক দূরীকরণ করে।
৭. ব্যাকটেরিয়া নির্ভর পদ্ধতিতে পানি থেকে আর্সেনিক দুরীকরণ সম্ভব।
৮. রাসায়নিক সারের ব্যবহার ও ফারাক্কা বাঁধের কারণে পানি প্রবাহের তারতম্যের সাথে আর্সেনিক দূষণের সম্পর্ক নেই।
৯. দুষিত পানির মাধ্যমেই মানবদেহে আর্সেনিকের প্রবেশ ঘটে ও অন্যান্য খাবারের সাথে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশের ঘটনার প্রমাণ মেলে না।

আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির কর্মকাণ্ড ও প্রচারণা বাকবাসনা ও এএবিইএ-র তুলনায় ভিন্নতর। ফারাক্কা কমিটি মনে করে আর্সেনিক সমস্যার মূল কারণ ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ফারাক্কা বাঁধ। সন্দেহ নেই যে ফারাক্কা বাঁধের কারণে বাংলাদেশে বিরূপ পরিবেশ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া থেকে ভূ-গর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি ও তার মাত্রা প্রমাণের সুযোগ নেই বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

বাফি আরো একটি ভিন্নধর্মী সংগঠন। বাফির সক্রিয় উদ্যোগে সম্প্রতি আমেরিকান কংগ্রেসম্যানদের সমন্বয়ে দ্বিদলীয় কংগ্রেশনাল বাংলাদেশ ককাস তৈরী হয়েছে। কংগ্রেশনাল বাংলাদেশ ককাস গঠনের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক বিষয় ও সমস্যাগুলো খতিয়ে দেখা। যে সকল বিষয়ে বাফি মার্কিন নীতি নির্ধারকদের সাথে একাধিক সফল মতবিনিময় ও আলোচনার ব্যবস্থা করেছে তাতে রয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ, খাবার পানি থেকে আর্সেনিক দূরীকরণ এবং মার্কিন-বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহযোগিতা। কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলী (ডে-নিউইয়র্ক)-এর উদ্যোগে বাংলাদেশ ককাস আর্সেনিক গবেষণা ও দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য দুই বিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহযোগিতার জন্য উচ্চপর্যায়ে লবিং শুরু করেছেন।

আমাদের অগ্রগতি :

এখন প্রশ্ন হচ্ছে গত দু' বছর আর্সেনিক দুর্যোগ মোকাবিলায় আমরা কতটুকু এগুতে পেরেছি? বাংলাদেশে ব্র্যাকসহ অনেকগুলো খ্যাতিমান বেসরকারি সংগঠন এখন মাঠ পর্যায়ে আর্সেনিক কবলিত এলাকাগুলোতে কাজ করছে। সাফল্যের তালিকা মোটামুটি উলে-খযোগ্য হলেও প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য। সংগঠনগুলোতে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব লক্ষ্যনীয়। এ ব্যাপারে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের অভাবও লক্ষ্যণীয়।

বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার কারণে এখন অনেকগুলো আর্সেনিক দূরীকরণ পদ্ধতি বাংলাদেশে ব্যবহার ও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এ বছরের মে মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো 'বাংলাদেশে আর্সেনিক দূরীকরণের উপর আন্তর্জাতিক কর্মশালা'। যৌথ উদ্যোক্তা ঢাকার বুয়েট এবং টোকিওর ইউনাইটেড নেশনস ইউনিভার্সিটি। বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত আর্সেনিক বিজ্ঞানীরা কুড়িটির মত গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

একটি উপস্থাপনায় নয়টি আর্সেনিক দূরীকরণ পদ্ধতি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা বিশেষভাবে উলে-খযোগ্য। মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় দেখানো হয় যে আলকান-এর শক্তিকৃত(Activated) এলুমিনা পদ্ধতি, সন-এর ৩-কলসী পদ্ধতি এবং স্টিভেন্সনের ২-বালতি পদ্ধতি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত কার্যকরী। সবগুলো দূরীকরণ পদ্ধতিই সাধারণভাবে ফ্লাকিউলেশন (থিতানী), এডজর্পশন (আটকানী) এবং ফিলট্রেশন (ছাকানী) প্রণালী নির্ভর। কিছু কিছু পদ্ধতিতে ফিটকিরি (এলাম) অথবা/এবং লোহার গুড়ার ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। যদিও উচ্চমাত্রার ফিটকিরির ব্যবহারের সাথে ক্রমবর্ধমান আলঝেইমার রোগের সম্পর্ক আছে বলে এখন অনেকে মনে করছেন।

আর্সেনিক দূরীকরণে ৩-কলসী পদ্ধতি এখন বাংলাদেশে অল্প দামের এবং সহজ পদ্ধতি হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ৩-কলসী পদ্ধতি ব্যবহৃত সবকিছুই বাংলাদেশের লোকজ। একটির উপরে আরেকটি করে তিনটি কলসী বসানো হয়। উপরের কলসীতে লোহার গুড়া ও মাঝারী আকারের বালির মিশ্রণ, মাঝের কলসীতে পোড়া কাঠের গুড়া ও মিহি বালির মিশ্রণ এবং নীচের কলসীতে আর্সেনিক মুক্ত সুপেয় পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা। তিন-কলসী পদ্ধতি আর্সেনিকের দুটো অজৈব রূপকেই দূর করতে সক্ষম। এই পদ্ধতিতে আর্সেনিক দূষণ মাত্রা সহজেই ১০ পিপিবিতে নামিয়ে আনা সম্ভব বলে উদ্ভাবকরা দাবী করেছেন। এই পদ্ধতির যৌথ উদ্ভাবকদের মধ্যে রয়েছেন বাকবাসনা সদস্য ডঃ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন

(নিউ ইয়র্ক), মোহাম্মদ হাবিবুদ্দৌলা (কেন্টাকি) ও ডঃ আবুল হুস্যাম (ভার্জিনিয়া)।

তিন-কলসী পদ্ধতির প্রতিটি ইউনিট কোন রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই প্রতিদিন ৫০ লিটার করে পাঁচ মাস পর্যন্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহে সক্ষম। প্রতিটি ইউনিটের দাম ৫-৬ মার্কিন ডলার। প্রতি পাঁচ মাসে একবার রিজেনারেশন দরকার হয় এবং তা ব্যবহারকারীদের জন্যও সহজসাধ্য। এই পদ্ধতিটির সাফল্যের কারণে বাকবাসনার সার্টিফিকেট অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

গ্রাম বাংলার আরেকটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো পানি বাসি করে খাওয়া। কলসিতে পানি ভরার পর কমপক্ষে চার ঘন্টা থিতানো জরুরী এবং থিতানো পানির শুধুমাত্র উপরিভাগ (তিন-চতুর্থাংশ) ঢেলে খাওয়া যুক্তিযুক্ত। পরবর্তী ব্যবহারের আগে কলসী ভালভাবে ধুয়ে নেয়াও আবশ্যক। বাংলাদেশের পানিতে উক্ত হারে (১.৩ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার) আয়রন থাকায় এ পদ্ধতি আংশিকভাবে কার্য্যকর। এ পদ্ধতিতে প্রায় বিনা খরচে ৭০ ভাগ পর্যন্ত আর্সেনিক দূরীকরণ সম্ভব।

পানি ফুটিয়ে খাওয়া উপকারী বিশেষ করে যদি সে পানিতে জীবাণু থাকে। যেমন নদী আর পুকুরের পানি। আগেই উলে-খ করা হয়েছে পানি ফুটালে আর্সেনিক দূরীকরণের কোন সম্ভাবনা নেই। বরং উল্টোই হয়। পানির পরিমাণ কমে যাবার কারণে আর্সেকিের মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেড়ে যায়। ভুপৃষ্ঠের পানি (পুকুর, নদী ও বৃষ্টি) যদি সঠিক পদ্ধতিতে অল্প খরচে সুপেয় পানিতে পরিণত করা যায় তবে আর্সেনিক সমস্যার অনেকটাই মিটে যায়। কারণ, ভূপৃষ্ঠের পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি শূন্যের কোঠায়। সমস্যা হলো বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অল্প দামে পানি বিশুদ্ধ ও সরবরাহ পদ্ধতির অভাব। বাংলাদেশে জ্বালানী কাঠের অভাব তীব্র। কাজেই ভূ-পৃষ্ঠের পানি ফুটিয়ে খাওয়া পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক বিচারে বিবেচ্য নয়।

ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহারে যে পদ্ধতিটি উজ্জ্বল সম্ভাবনার দাবিদার সেটা হলো সৌরশক্তির সঠিক ব্যবহার। সৌরশক্তিতে যে সামান্য পারিমাণ অতিবেগুনী রশ্মী আছে তা পানির জীবাণুমুক্তিতে কার্য্যকরী। সৌরশক্তি ও তিন কলসী পদ্ধতির সঠিক সমাহারে বাংলাদেশের পানীয় জলের দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান দিতে সক্ষম বলে এ লেখকের বিশ্বাস। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ যাবতীয় কারণে ভু-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহারে ফেরত গেলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না।

এক্ষণে দরকার বাংলাদেশ সরকারের সুদুরপ্রসারী ও বাস্তবসম্মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতিমালা। সেদিন হয়ত বেশি দূরে নয় যখন বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে সাধারণ ভোটার-জনতা বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য মিছিল করবে।

<u>পরিশেষ :</u>

প্রবাসী বাংলাদেশী পেশাজীবী ও পেশাজীবী সংগঠনসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অদূর ভবিষ্যতে এ সংগঠনগুলো কিছু কিছু জাতীয় সমস্যা নিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করলে আর্সেনিকের মত কঠিন ও জটিল সমস্যাও আরো সহজভাবে মোকাবেলা সম্ভব। সেদিন হয়ত বেশী দূরে নয়। ❑

সিলিকন ভ্যালি, ক্যালিফোর্নিয়া

২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০০১।

‘পড়শী’তে আপনার পণ্যের বিজ্ঞাপন দিন
বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য
আমাদের ওয়েব সাইটে আসুন
www.porshi.com

আর্সেনিক বিষয়ক ব্যাপারসমূহ ১৯ পৃষ্ঠার পর

বা পায়ের তলাতে ছোট ছোট গ্রন্থি/পিণ্ড দেখা দিতে পারে।
৫-১০ বছর আর্সেনিক আক্রান্ত থাকার পরে নিচের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়:
জটিলতাসমূহ : ক্লিনিক্যাল লক্ষণসমূহ আরও বেশি চোখে পড়তে শুরু করে এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ আক্রান্ত হয়। লিভার, কিডনী বড় হয়ে যায় এবং রোগী অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কিছু রিপোর্টে দেখা যায়, এ অবস্থায় আর্সেনিকের সাথে কনজাংটিভাইটিস, ব্রংকাইটিস ও ডায়াবেটিসের সম্পর্ক রয়েছে।
মারাত্মক অবস্থা : স্কিন-ক্যান্সার এবং টিউমার দেখা দেয়। এছাড়াও গ্যাংগ্রিন অথবা ফুসফুসের এবং ব-াডার-ক্যান্সার রোগীর দেহে বৃদ্ধি লাভ করতে পারে। ❑

ঢাকা, বাংলাদেশ।

অনুবাদ : জুবায়দুর শিরন।

মূত্র পরীক্ষা ভিত্তিক ... ২০ পৃষ্ঠার পর

বাড়াতে সাহায্য করে। বাচ্চাদের শরীরে এই পদ্ধতি খুবই মন্থর। এদেরকে এই জাতীয় খাবার ও ভিটামিন খাওয়ালে তা শরীরে আর্সেনিক এর প্রাণরসায়ন প্রতিক্রিয়ায় সাহায্য করবে।

লেখক নিউইয়র্ক এ তার ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন যা দিয়ে আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের মূত্র থেকে DMAA ও MMAA সনাক্ত করা যায়। তিনি এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষদের দুটি ভাগে ভাগ করেছেন।

<u>মূত্রে DMAA ও MMAA কম :</u>

এই সমস্ত মানুষ এবং শিশুর শরীর আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত। এদের শরীর আর্সেনিক এর প্রাণরসায়ন প্রতিক্রিয়া করতে পারে না বা করার ক্ষমতা কম। এদেরকে ভিটামিন B12, B6, ফোলেট ও কোলিনযুক্ত খাবার আর্সেনিক প্রাণরসায়ন প্রতিক্রিয়ায় সাহায্য করবে।

<u>মূত্রে DMAA ও MMAA বেশি :</u>

এই সমস্ত মানুষ-এর শরীর আর্সেনিক সহজেই ভাঙ্গতে সক্ষম এবং আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় সহসা আক্রান্ত নয়।

লেখকের এই মূত্র পরীক্ষার ফলাফল তিনি ICHM ও ICDDRB আয়োজিত সেমিনারে পাঠ করেন। এই পদ্ধতি দ্বারা বাংলাদেশের আর্সেনিকজনিত প্রকোপ অন্তত কিছুটা আয়ত্বে আনা যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। মূত্র পরীক্ষা ব্যবহার করে আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত মানুষদের সনাক্তকরণ- বিভাজন ও ভিটামিন দিয়ে চিকিৎসা বাংলাদেশে এই প্রথম। লেখকের ইনট্রনিকস টেকনোলজি সেন্টার বাংলাদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ❑

অনুবাদ : বজফ।

ড: মোহাম্মদ আলাউদ্দীন : অধ্যাপক, ওয়েগনার কলেজ, নিউ ইয়র্ক এবং প্রতিষ্ঠাতা, ইনট্রনিক্স টেকনলজি সেন্টার, ঢাকা, বাংলাদেশ।